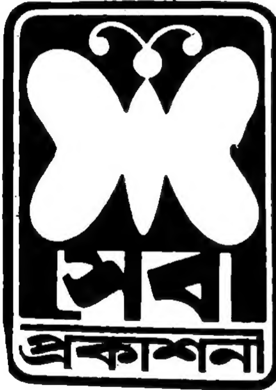
প্রেতপুরী

অনীশ দাস অপু

হরর থ্রিলার





একত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-0197-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা টিপু কিবরিয়া

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

PRETPURY
A Horror Thriller
By: ANISH DAS APU

সিনোরিনা, তোমাকে



সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন: হলো না, রত্না, বন্দিনী, বিষ, বিশ্বাসঘাতক, পাপে মৃত্যু, দাঁড়াও পথিক, আর্তনাদ, নির্বাচিত রোমাঞ্চগল্প-২
শেখ আবদুল হাকিম: দড়াবাজ স্পাই ১,২, কামিনী, আততায়ী ১, ২, বিষদাঁত
রকিব হাসান: বিদেশ যাত্রা ১, ২, অবসর বিনোদন, মৃত্যুচুম্বন
ইউসুফ ফারুক: দ্বীপ বিভীষিকা
ঊর্মি রহমান: তাহলে কে, মধুচন্দ্রমা, ওরা কোথায়, রক্তাক্ত বড়দিন
শওকত হোসেন: রানওয়ে জিরো এইট, শুভ্রশত্রু, অন্তর্ঘাত, উপদ্রব, সন্ত্রাস
হিফজুর রহমান: ধূসর দেয়াল, অতল প্রলোভন
সুধাময় কর: কামিনী কাঞ্চন ১, ২।
কাজি মাহবুব হোসেন: গ্যালাক্সি পেরিয়ে, উত্তরাধিকার, অশুভ সঙ্কেত
মোবারক হোসেন খান: হত্যাকারী
বিশু চৌধুরী: ছায়া শিকারী ১, ২, অন্ধচক্র
হাসান উৎপল: ফেরারী, মৃত্যুদূত
মামনুন শফিক: নগ্নমুখ
রওশন জামিল/কাজী আনোয়ার হোসেন: দাগী আসামী ১, ২
নিয়াজ মোরশেদ/কাজী আনোয়ার হোসেন: স্যাবটাজ ১, ২
নিয়াজ মোরশেদ: মরণ ফাঁদ ১, ২, বন্দীশিবির ১, ২
মার্থা মেকেনা: আমি গুপ্তচর
সেলিম হোসেন টিপু: গুণ্ডা, শোধ নেবে?
মোস্তাফিজুর রহমান: আমি উন্মাদ?
খন্দকার মজহারুল করিম: সব মানুষের পৃথিবী
ইফতেখার আমিন: মরীচিকা ১, ২, ক্ষুরদাত
কাজী সারোয়ার হোসেন: আড়াল
বাবুল আলম : নর্তক
মোনা চৌধুরী: তিন মিনারে খুন, খুনের মোটিভ
রোকসানা নাজনীন: তৃতীয় নয়ন
তাহের শামসুদ্দীন: একদিন সকালে, লোভে পাপ, শিবসেনার মৃত্যুফাঁদে, মৃত্যুর কারিগর, মণিকার সুখ, প্রেত শক্তি।
কাজী শাহনূর হোসেন: প্রফেসর মাসুদ রানা
খসরু চৌধুরী: দালানবাড়ি, প্লেন ক্র্যাশ।
অনীশ দাস অপু: আতঙ্কের প্রহর।

এক

ফ্লোরা রোজমেরী হাসান ওরফে রোজী ও সীমান্ত হাসান পশ্চিম ধানমণ্ডিতে তিন রুমের একটি বাড়ি ভাড়ার ব্যাপারে কথাবার্তা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিল। কিন্তু বাদ সাধল একটা টেলিফোন। 'সন্ধান' নামে একটা প্রতিষ্ঠান থেকে সাখাওয়াত কবীর নামের এক ভদ্রলোক জানাল, মনিপুরী পাড়ায় চাররুমের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে সুলভ মূল্যে। অ্যাপার্টমেন্টের নাম 'ড্রিম হাউজ'। ভিক্টোরিয়ান স্টাইলে নির্মিত সাজানো-গোছানো, পুরানো এই বাড়িটির প্রতি ফ্লোরা রোজমেরী এবং সীমান্তর লোভ অনেক আগে থেকে। বিয়ের পরপরই এই অ্যাপার্টমেন্টের একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে কম চেষ্টা করেনি ওরা। কিন্তু কাজ হয়নি কোন। এর কারণ সম্ভবত এটাই যে, এখানকার খালি ফ্ল্যাটে একবার ভাড়াটে উঠলে সহজে নামতে চায় না। বাইরে থেকে অ্যাপার্টমেন্ট হাউজটাকে প্রাচীনকালের জমিদার বাড়ি বলে মনে হয়। কিন্তু ভেতরে নাকি এলাহীকাণ্ড। বসবাসের অত্যাধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে প্রতিটি ফ্ল্যাটে। সীমান্ত 'সন্ধান'কে অনেক আগেই মেসেজ দিয়ে রেখেছিল। প্রতিষ্ঠানটিতে ওর এক চেনা লোক আছে। তার কাজ হচ্ছে কম ভাড়ায় সুবিধে মাফিক ফ্ল্যাটের সন্ধান করা। এ জন্য কোম্পানি থেকে বেতন ছাড়াও সন্তুষ্ট মক্কেলের কাছ থেকে আলাদা একটা কমিশন পায় সে। এই লোকটি অর্থাৎ সাখাওয়াত কবীরকে সীমান্ত বলে রেখেছিল মনিপুরী পাড়ার ড্রিম হাউজের কোন ফ্ল্যাট

খালি হলে যেন সাথে সাথে তাকে জানায়। বর্তমানে, রায়ের বাজারে যে ফ্ল্যাটে ওরা আছে, এখানে পানি নিয়ে বাড়িওয়ালা বড্ড যন্ত্রণা দেয় বলে বেশ কিছুদিন ধরে বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছিল রোজী এবং সীমান্ত। ড্রিম হাউজে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া পাবার গোপন আশা ওদের মনে ছিল, দিন যেতে ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছিল ওরা এ ব্যাপারে খবর না পেয়ে। কবীরের কাছে বেশ কয়েকবার ফোন করেও আশাব্যঞ্জক কিছু শুনতে পায়নি সীমান্ত। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে পশ্চিম ধানমণ্ডিতে একটা কাজ চলার মত বাড়ি খুঁজে নিয়েছে। কিন্তু এখন, বহু আকাঙ্ক্ষিত ড্রিম হাউজে ফ্ল্যাট খালি হয়েছে শুনে রোজী প্রথমে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেও ধানমণ্ডির কথা মনে পড়তে চুপসে গেল।

'অনেক দেরি হয়ে গেছে,' সীমান্ত ফোনে বলল সাখাওয়াত কবীরকে। 'আমরা গতকালই আরেকটা বাড়ি ভাড়ার ব্যাপারে কথা পাকাপাকি করে ফেলেছি।' সীমান্তর আস্তিন খামচে ধরল রোজী। 'চুক্তিটা বাদ দেয়া যায় না?' স্পষ্ট অনুনয় ওর চোখে। 'ওদের কিছু বলো না!'

'এক মিনিট, কবীর সাহেব,' স্ত্রীর দিকে মুখ ফেরাল সীমান্ত। 'কি বলব?'

অসহায় ভঙ্গিতে হাতের তালু ওল্টাল রোজী। 'আমি কি জানি! সত্যি কথাটাই না হয় জানিয়ে দাও। বলো মনিপুরী পাড়ায় একটা ফ্ল্যাট পেয়ে গেছি হঠাৎ কম ভাড়ায়।'

'কিন্তু তাতে ওদের কি আসে যায়?' বলল সীমান্ত।

'যা হোক একটা কিছু বলে ওদের ম্যানেজ করো, সীমান্ত, প্লীজ। আর কবীর সাহেবকে বলো আমরা শীঘ্রি তাঁর বাড়ি দেখতে যাব। তাড়াতাড়ি করো না। ফোন রেখে দেবে তো!'

'কিন্তু ধানমণ্ডির পার্টির সঙ্গে আমাদের কথা তো ফাইনাল...'

সীমান্তকে কথা শেষ করতে দিল না রোজী, ফোনটা ওর

গালের ওপর চেপে ধরে কপট রাগে চোখ রাঙাল, 'আহ্! আগে এই ভদ্রলোকের সাথে কথা শেষ করো!'

মৃদু হেসে সীমান্ত বলল, 'কবীর সাহেব? শুনুন, আমরা আগের পার্টির সঙ্গে ম্যানেজ করে নেব। কারণ ওদেরকে অগ্রিম কোন টাকা দেইনি এখনও। শুধু মৌখিকভাবে কথা হয়েছে। আমরা আসলে ড্রিম হাউজের ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী। বিশেষ করে আমার স্ত্রী। একবার দেখা যাবে ফ্ল্যাটটা?'

'অবশ্যই,' ওধার থেকে জবাব দিল সাখাওয়াত কবীর। 'রাস্তা চেনেন তো? সাতাশ নম্বর দিয়ে ঢুকে...'

'চিনি আমি,' বাধা দিল ওকে সীমান্ত। 'একবার গিয়েছিলাম ওদিকে। শুধু বাইরে থেকে দেখে এসেছি। আর তাতেই আমার স্ত্রী এত মুগ্ধ...' হাসল সাখাওয়াত কবীর। 'সেভেন-ই ফ্ল্যাটটা খালি হয়েছে। স্টিফেন গনজালেস নামে এক ভদ্রলোক আছেন। ম্যানেজার। ওখানে গিয়ে ওঁর সাথে যোগাযোগ করলেই হবে। উনিই সব ঘুরিয়ে দেখাবেন।'

'ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ, কবীর সাহেব,' বলল সীমান্ত। 'আমরা আজকেই যোগাযোগ করব।'

'না। না। ধন্যবাদের কি আছে,' বিনয়ে বিগলিত সাখাওয়াত। 'আপনি, স্যার, বিখ্যাত মানুষ। বিপদে পড়েই না আমাদের স্মরণ করেছেন। এই অধমের কথা একটু মনে রাখলেই বান্দা খুশি।'

'জ্বী, রাখব,' হাসি চেপে বলল সীমান্ত। 'এখন রাখি। কেমন?'

খুশিতে ঝলমল করে উঠল রোজী। 'চলো, এক্ষুণি যাই।'

'তবে তোমার ড্রিম হাউজে কিন্তু নার্সারী নেই,' ওকে বাজিয়ে দেখছে সীমান্ত।

'নার্সারী না থাকলেও কিছু যায় আসে না,' ওয়ার্ডরোব থেকে শাড়ি বের করতে করতে বলল রোজী। 'তোমার ধানমণ্ডির সাদা জেলখানায় তো আর ঢুকতে হবে না।'

'গতকালও কিন্তু এই জেলখানার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলে তুমি।' হাসছে সীমান্ত হাসান।

'পঞ্চমুখ ছিলাম কথাটা বাড়িয়ে বললে। বাজি—কোন আর্কিটেক্টই ওই বাড়ি পছন্দ করবে না। যাক গে, ড্রিম হাউজের লিভিংরুমে সময় হলে আমরা নার্সারী রুম বানিয়ে নেব, কি বলো?'

'ঠিক হ্যায়,' সায় দিল সীমান্ত। ব্যস্ত হয়ে পড়ল ইলেকট্রিক রেজর নিয়ে। দাড়ি কামাতে কামাতে আড়চোখে দেখল রোজী হলুদ, কাঞ্জিভরম শাড়িতে নিজেকে অপরূপা করে তোলার চেষ্টায় ব্যস্ত। ভাবতে ভাল লাগল ফর্সা, সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গিণী মেয়েটি একান্ত তারই।

শুক্রবার বলে রাস্তায় জ্যামে পড়তে হলো না। স্কুটার নিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে রায়েরবাজার থেকে মনিপুরী পাড়ার ৮/১০ নম্বর বাড়িটিতে চলে এল ওরা। মি. স্টিফেন গনজালেসের খোঁজ করতে ভৃত্য শ্রেণীর এক ছোকরা বেঁটেখাট, মোটা চেহারার এক মধ্যবয়স্ক লোককে ডেকে নিয়ে এল। গনজালেসের দু'হাতে একটি আঙুলও নেই। ফলে হ্যান্ডশেকের ব্যাপারটি স্বাভাবিক ভাবেই অপর পক্ষের কাছে বিব্রতকর মনে হয়। তবে এটা মি. স্টিফেনের কাছে মোটেই অস্বস্তিকর কিছু নয়। তিনি সহাস্যে সীমান্তর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনাকে বেশ চেনা চেনা লাগছে, মি. হাসান। কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

কাটা আঙুলের গাঁটগুলো হাত দিয়ে স্পর্শ করল সীমান্ত। শিরশির করে উঠল গা খড়খড়ে চামড়ার স্পর্শে। মুখে জোর করে হাসি ফোটাল ও, 'রাস্তায় হাঁটার সময় কোথাও হয়তো আপনার সঙ্গে ধাক্কাটাক্কা খেয়েছি।'

'না, না। এই তো মনে পড়েছে।' হাসিটা মুখে ধরে আছেন মি. স্টিফেন। ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন লিফটের দিকে। ডান

হাতের মধ্যমার গাঁট দিয়ে লিফটের বোতামে চাপ দিলেন তিনি। 'বরকতউল্লাহর "সুখের পাখি অনেক দূরে" নাটকে দেখেছি আপনাকে। আপনি অভিনয় করেন, তাই না? আমাদের এখানে ফিল্ম এবং নাটকের কয়েকজন প্রডিউসার আছেন। আচ্ছা, আপনি কোন্ কোন্ সিরিয়ালে আছেন?'

'অনেক,' বলল সীমান্ত। 'আমি হুমায়ূন আহমেদের "আজ রবিবার"-এ কাজ করেছি, তাই না রোজ? তারপর "সবুজ সাথী"...'

'ও ঠাট্টা করছে,' বলল রোজী। 'সীমান্ত "যেখানে আকাশ নীল" এবং "পদ্ম পাতায় জল"-এ অভিনয় করেছে। এ ছাড়া বেশ কিছু ধারাবাহিকেও কাজ করেছে।'

'টিভি কমার্শিয়ালে প্রচুর পয়সা, না?' জিজ্ঞেস করলেন স্টিফেন গনজালেস।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রোজী। যোগ করল সীমান্ত, 'আর রোমাঞ্চও আছে প্রচুর।'

লিফটের দরজা খুলে গেল। ওক প্যানেলের লিফট, দু'পাশের হাতল ঝকঝকে পেতলের। ইউনিফর্ম পরা, নিগ্রোদের মত দেখতে ছোকরা বয়সী কালুয়া লিফটম্যান ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'সাততলা,' বললেন গনজালেস। ভেতরে ঢুকল সবাই। মি. স্টিফেন ঘুরে দাঁড়ালেন রোজমেরী ও সীমান্তর দিকে। 'এই অ্যাপার্টমেন্টটি চার রুমের, দুই বাথ, তিনটে ক্লজিটও আছে। আগে এই বাড়ির অ্যাপার্টমেন্টগুলো বেশ বড় ছিল। সবচেয়ে ছোটটাতেও কমপক্ষে ছ'টি ঘর ছিল। কিন্তু ভাড়া পড়ে যেত খুব বেশি। এখন বেশির ভাগ ভেঙে দুই, তিন এবং চার রুমের অ্যাপার্টমেন্ট করা হয়েছে। আপনাদেরটা, অর্থাৎ সেভেন-ই ছিল এক ইউনিটের আট রুমের বিশাল এক অ্যাপার্টমেন্ট। ওটাকে ভেঙে এখন দুই ইউনিট করা হয়েছে। ঘর পছন্দ হলে আপনারা মূল কিচেন এবং মাস্টার বাথ

ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। এখন যেটা লিভিংরুম, আগে ওটা ছিল মাস্টার বেডরুম। এছাড়া আরও একটা বেডরুম রয়েছে। দুটো সার্ভেন্টসরুম ভেঙে করা হয়েছে ডাইনিংরুম, এটাকে দ্বিতীয় বেডরুম হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে। আপনাদের বাচ্চা-কাচ্চা আছে?'

'নেব ভেবেছি,' বলল রোজী। 'তাহলে এই ঘরটিকে নার্সারী রুম হিসেবে দিব্যি ব্যবহার করতে পারবেন। এই ঘরে গোটা একটা বাথরুম ছাড়াও বড় একটি ক্লজিটের সুবিধে পাবেন। আসলে পুরানোটা ভেঙে নতুন অ্যাপার্টমেন্টগুলো করাই হয়েছে আপনাদের মত নব দম্পতিদের কথা ভেবে।'

লিফট থেমে গেল। ঝকঝকে সাদা দাঁত মেলে ধরে গেট খুলল লিফটম্যান, বোতাম টিপে খুলে দিল বাইরের রোলিং ডোরও। মি. স্টিফেন সরে দাঁড়ালেন একপাশে, রোজী আর সীমান্ত পা রাখল আবছা অন্ধকার হলওয়েতে। মিটমিটে আলো জ্বলছে সিলিং-এ। হলওয়ের দেয়ালের রঙ সবুজ। 'সেভেন-বি' লেখা একটি সবুজ দরজা নিয়ে ব্যস্ত ছিল এক লোক। ওদেরকে এক নজর দেখে 'পিপহোল' বসানোর কাজে আবার মনোযোগ দিল সে।

মি. স্টিফেন গনজালেস রোজমেরী ও সীমান্তকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। প্রথমে ডানে তারপর বাঁয়ে মোড় নিল ওরা। রোজী এবং সীমান্ত দু'জনেই লক্ষ করল গাঢ় সবুজ রঙের হলওয়ের ওয়াল-পেপার কয়েক জায়গায় ছেঁড়া। গাম লাগিয়ে নতুন করে জুড়ে দিলেও ভাঁজ খেয়ে আছে দু'এক জায়গায়। কাঠ-গ্লাসের কুলঙ্গিতে রাখা বাতি নিশ্চই ফিউজ। কারণ জ্বলছে না। ঘন সবুজ রঙা কার্পেটের ক্ষত ঢাকতে হালকা সবুজ টেপ মুড়ে দেয়ার ব্যাপারটিও ওদের চোখ এড়াল না। সীমান্ত স্ত্রীর দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে চাইল: তাপ্পিমারা কার্পেট? বাইরে থেকে এ বাড়ির জৌলুসের কথা সে যা শুনেছে এখন কল্পনার সাথে বাস্তবের ফারাক দেখে মনে মনে হতাশ

হতে শুরু করেছে। কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে হাসল রোজী, যেন বলতে চাইল: তারপরও বাড়িটি আমার পছন্দ হয়েছে। বেশ লাগছে!

'এর আগে এখানে মিসেস আভা পলগুডা থাকতেন,' ওদের দিকে না ফিরেই বললেন মি. স্টিফেন। 'কিছুদিন আগে মারা গেছেন ভদ্রমহিলা। ফ্ল্যাট থেকে তার কোন জিনিস এখন পর্যন্ত সরানো হয়নি। তাঁর একমাত্র ছেলে কানাডা থাকে। সে অবশ্য আমাকে বলেছিল এখানে যে ভাড়াটে আসবেন তাঁরা তাঁর মা'র ব্যবহৃত আসবাব, এয়ারকুলার ইত্যাদি রাখবেন কিনা জিজ্ঞেস করতে।'

'ভদ্রমহিলার ছেলে এখন কোথায়?' জানতে চাইল সীমান্ত।

'হোটেল শেরাটনে উঠেছেন। শুনেছি দু'একদিনের মধ্যে আবার কানাডায় ফিরে যাবেন।' আবার মোড় ঘুরলেন মি. স্টিফেন। এদিকের দেয়ালগুলোর ওয়াল-পেপার অপেক্ষাকৃত নতুন মনে হলো ওদের কাছে। সবুজের সাথে সোনালি স্ট্রাইপও আছে।

'উনি কি এ বাড়িতেই মারা গেছেন?' জিজ্ঞেস করল রোজী। 'নাকি—'

'না, না। হাসপাতালে।' জবাব দিলেন স্টিফেন। 'বেশ কয়েকদিন ''কোমা''য় ছিলেন মিসেস পলগুডা। অজ্ঞান অবস্থাতেই মারা যান। বয়সও হয়েছিল অনেক। অমন আরামের মৃত্যু সময় হলে আমিও কামনা করব। শেষের দিকে বৃদ্ধা একাই সব কাজ করতেন—রান্না, বাজার হাট…তাঁর ছেলে তাঁকে বহুবার কানাডা নিয়ে যেতে চেয়েছেন। রাজি হননি মিসেস পলগুডা। কি যে মায়ায় পড়ে গিয়েছিলেন ঢাকা শহরের, কে জানে!'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা হলঘরের শেষ মাথায়, সিঁড়ির সামনে চলে এল। সিঁড়ির সাথে, বাঁ দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাপার্টমেন্ট সেভেন-এ। তবে এই ফ্ল্যাটের দরজায় খোদাই করা কিছু নেই, বরং

অন্যগুলোর চেয়ে এটা অনেক সরু। মুক্তোখচিত বেল বাটনে চাপ দিলেন মি. স্টিফেন—ওটার ওপরে কালো প্লাস্টিকে সাদা অক্ষরে লেখা এ. পলগুডা। তালায় চাবি ঢুকিয়ে একটা মোচড় দিয়ে ধাক্কা মেরে দরজা খুললেন স্টিফেন গনজালেস। 'ভেতরে যান, প্লীজ,' সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে বিনীত ভঙ্গিতে বললেন তিনি, বাড়ানো হাত দিয়ে খুলে রাখলেন দরজা।

ফ্ল্যাটের চারটে ঘরকে দুই দিকে ভাগ করে রেখেছে সরু, সেন্ট্রাল হলওয়ে। সামনের দরজা থেকে হলঘরের বিস্তৃতি শুরু। ডানদিকের প্রথম ঘরটি কিচেন, বিশাল আয়তন দেখে খুশিতে উদ্ভাসিত হলো রোজী। ওরা এখন যে বাড়িতে আছে, তার চেয়ে এই রান্নাঘরটা অনেক বড়, ছাদটাও কত উঁচু। চার বার্নারের গ্যাসের চুলা তো আছেই, একটা ওভেনও রয়েছে বাড়তি। অথচ রায়ের বাজারের বাসায় মাত্র এক বার্নারের চুলা। নিজের গাঁট থেকে বিল দিতে হবে বলে শয়তান বাড়িওয়ালা দু'বার্নারের চুলাও কোন ভাড়াটেকে লাগাতে দেয়নি। এখানকার সিঙ্কটাও কত বড়! সংসদ ভবনের দিকে মুখ করা জানালা দেখে সন্তুষ্ট হলো রোজী।

রান্নাঘরের বিপরীতে ডাইনিং কাম সেকেন্ড বেডরুম। দেখে মনে হলো, মিসেস পলগুডা এ-ঘরে বসে শুধু পড়াশোনাই করতেন না, এটাকে তিনি রীতিমত একটা বাগান বানিয়ে রেখেছিলেন। কাচের জারে অসংখ্য ফুল গাছ। বেশিরভাগ মরা, বাকিগুলো মরোমরো করছে। ওগুলোর মাঝখানে, একটি রোল-টপ ডেস্কে বই আর পত্রিকা বোঝাই। ডেস্কটি বেশ বড়, পুরানো হলেও দেখতে সুন্দর। সীমান্ত আর স্টিফেন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে, রোজী বিবর্ণ ফুলগাছের জারের মাঝখান থেকে পথ করে ডেস্কের দিকে এগোল। এরকম ডেস্ক আজকাল শুধু অ্যান্টিকস-এর দোকানেই দেখা যায়। ডেস্কটা স্পর্শ করল ও, অবাক হয়ে ভাবল

এমন জিনিসও কেউ বিক্রি করে!

'মিসেস পলগুডার ছেলে কি এই ডেস্কটাও বিক্রি করে দেবেন?' জিজ্ঞেস করল রোজী।

'জ্বী,' জবাব দিলেন মি. স্টিফেন। 'এত ভারী জিনিস তিনি নিয়ে যাবেনই বা কি করে?'

'জিনিসটা সুন্দর,' মন্তব্য করল সীমান্ত।

'আসলেও তাই, না?' হাসল রোজী। চোখ ফেরাল দেয়াল আর জানালার দিকে। নার্সারী হিসেবে চমৎকার মানিয়ে যাবে ঘরটা। বোনাস হিসেবে বাথরুমও আছে। যদিও একটু ছোট। ক্লজিটে প্রচুর চারাগাছ দেখতে পেল ও, এখনও তাজা।

'কি ওগুলো?' স্ত্রীর দিকে ঘুরল সীমান্ত।

'বেশিরভাগই চারাগাছ,' বলল রোজী। 'পুদিনার চারাই বেশি...ব্যাকিগুলো চিনি না।'

হলঘরের বাঁ দিকে একটি গেস্ট ক্লজিট, ডানে বেশ প্রশস্ত খানিকটা জায়গা ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে মিশেছে লিভিংরুমের সাথে। বিপরীত দিকে বড় বড় কয়েকটি জানালা, দুটোর শার্সি আবার ঝলমলে রঙিন। বাঁ দিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ওক কাঠের উঁচু বুক শেলফ। একমাত্র বিদেশী ছবিতেই এ ধরনের লিভিংরুম দেখেছে ফ্লোরা রোজমেরী।

বেডরুমটাও বিশাল। জানালা দিয়ে ড্রিম হাউজের নিচের সরু, খোলা চত্বর চোখে পড়ল। লিভিংরুমের পরেই প্রকাণ্ড বাথরুম, সাদা ধবধবে, সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণসহ। কল খুলতেই ছরছর করে পানি পড়তে শুরু করল। স্টিফেন গনজালেস জানালেন, 'এ বাড়িতে পানির কোন সমস্যা নেই। সারা দিনে মোট চারবার মোটর ছেড়ে বিশাল ট্যাঙ্কি ভরে রাখা হয়।'

'দারুণ বাসা!' খুশিতে উথলে উঠল রোজী, ফিরে এল লিভিংরুমে। 'আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে!'

'অত উচ্ছ্বসিত হয়ো না,' বলল সীমান্ত। 'তাহলে মি. স্টিফেন নির্ঘাত ভাড়া বাড়িয়ে দেবেন।'

'পারলে করতাম,' মৃদু হাসি মি. গনজালেসের ঠোঁটে। 'কিন্তু সে সুযোগ নেই। যদিও আজকাল এত সস্তা ভাড়ায় এ রকম বাড়ি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। নতুনগুলো—' হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি, মেইন হলরুমের মাথায় একটি মেহগনি কাঠের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দিকে তাকালেন। 'আরে, ওটা কি!' বললেন তিনি। 'ওই টেবিলের পেছনে একটা ক্লজিট থাকার কথা। নিশ্চই থাকবে। এ ফ্ল্যাটে মোট তিনটে ক্লজিট: একটা শোবার ঘরে, একটা হলঘরে, বাকিটা ওখানে।' টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলেন মি. স্টিফেন।

সীমান্ত গোড়ালিতে ভর করে উঁচু হলো। 'ঠিক বলেছেন। আমি ক্লজিটের দরজার একটা কোনা দেখতে পাচ্ছি।'

'মিসেস পলগুডা হয়তো ওটা সরিয়েছেন,' বলল রোজমেরী। 'টেবিলটা ওখানে থাকার কথা ছিল।'

আঙুল তুলে বেডরুমের দরজার পাশের দেয়াল দেখাল সে। ওখানের লাল টকটকে কার্পেটের ওপর টেবিল রাখার চিহ্ন স্পষ্ট, গভীরভাবে এখনও দেবে আছে চারটে পায়ার ছাপ। দেয়ালের প্লাস্টার উঠে গেছে, সম্ভবত টেবিলটা সরানোর সময় ধাক্কা লেগে। কার্পেটেও হালকা দাগ আছে, হিঁচড়ে নিয়ে যাবার প্রমাণ।

'একটু হাত লাগাবেন দয়া করে?' সীমান্তকে ডাকলেন মি. স্টিফেন।

দু'জনে মিলে একটু একটু করে টেবিলটাকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল আগের জায়গায়। 'ভদ্রমহিলা কেন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন এখন বুঝতে পারছি,' ঠেলতে ঠেলতে বলল সীমান্ত হাসান।

'কিন্তু তাঁর একার পক্ষে এই টেবিল সরানো অসম্ভব ব্যাপার ছিল,' বললেন মি. স্টিফেন। 'তাঁর বয়স ছিল ঊননব্বই।'

সন্দেহের চোখে ক্লজিট ডোরের দিকে তাকাল রোজী। 'এটা কি আমাদের খোলা ঠিক হবে? ভদ্রমহিলার ছেলে আবার কি মনে করেন!'

সেক্রেটারিয়েট টেবিল আগের জায়গায় বসানো হয়েছে। মি. গনজালেস নিজের আঙুলবিহীন হাত ম্যাসেজ করতে করতে বললেন, 'এই বাড়ির সব কিছু আপনাদেরকে দেখানোর অনুমতি আমাকে দেয়া হয়েছে।' ক্লজিট ডোর খুলে ফেললেন তিনি। ভেতরটা প্রায় খালি; একপাশে একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আর অন্যপাশে তিন/চারটে কাঠের বোর্ড। শেলফের ওপরের তাক নীল আর সবুজ তোয়ালেতে ভর্তি। লেপ-কাঁথাও আছে।

'এই সামান্য জিনিস এভাবে গোপন রাখার মানে ঠিক বুঝলাম না,' বলল রোজী।

কাঁধ ঝাঁকালেন স্টিফেন গনজালেস। 'কারণটা আমিও জানি না। শেষদিকে বুড়িকে ভীমরতিতে ধরেছিল কিনা কে জানে।' হাসলেন তিনি। 'যাকগে, আপনাদের আর কিছু দেখার বা জানার আছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রোজমেরী হাসান। 'আমরা কবে নাগাদ এই বাসায় উঠতে পারব এখন সেটা বলুন।'

দুই

ডিসেম্বর মাসের এক তারিখেই নতুন বাসায় উঠতে পারবে জেনে খুশি মনে নিজেদের ডেরায় ফিরে এল রোজী ও সীমান্ত হাসান। চার রুমের অতবড় বাড়িটা অত্যন্ত সস্তায় পেয়ে গেছে ওরা। মাত্র আট হাজার টাকা ভাড়া। তাও দু'মাসের অ্যাডভান্স দিলেই চলবে। অথচ ধানমণ্ডির বাড়ির মালিক ওদের কাছে চার মাসের অ্যাডভান্স চেয়েছিল। তাও নেই লিফট। একান্ত বাধ্য হয়ে ফ্ল্যাটটা ভাড়া নেয়ার কথা ভেবেছিল ওরা। রায়ের বাজারের ঘিঞ্জি আর নোংরার মধ্যে বাস করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছিল দু'জনে। ব্যাচেলরদের কেউ বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না। কিন্তু অর্থলোভী এই বাড়িওয়ালাটা সীমান্ত অবিবাহিত জেনেও ভাড়া দিয়েছে আসল ভাড়ার প্রায় দেড়গুণ আদায় করে। দু'রুমের একটা ফ্ল্যাট, পানির সমস্যা প্রকট, তাও রায়েরবাজারের মত এলাকায় পাঁচ হাজার টাকা ভাড়া—ভাবা যায়! অবশ্য উপায়ও ছিল না সীমান্তর। মেসে থাকতে থাকতে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। প্রাইভেসী রক্ষা করা যাচ্ছিল না কোনমতেই। তখন মাত্র অভিনেতা হিসেবে একটু-আধটু নাম করতে শুরু করেছে সে। অবশ্য রোজীর সাথে ওর প্রেম তখন চূড়ান্ত পর্বে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্রী ফ্লোরা রোজমেরীর তখন ফাইনাল ইয়ার চলছে। মাস্টার্সটা কমপ্লিট করার আগেই ও দুম করে বিয়ে করে বসে সীমান্তকে। কারণ এক বড়লোক ব্যবসায়ীর ছেলের সাথে বিয়ে প্রায় পাকা করে ফেলেছিলেন রোজীর বাবা।

বিধর্মী ছেলের সাথে মেয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা চাপা থাকেনি তাঁর কাছে। শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। কিন্তু বাধা দেয়ার আগেই, অপকর্মটা ঘটিয়ে বসে রোজী। প্রচণ্ড শক্‌ড্ হয়েছিলেন রোজীর বাবা। অসম্ভব রকম গোঁড়া মানুষ তিনি। প্রতিজ্ঞা করেছেন জীবনেও ধর্মচ্যুত মেয়ের মুখ দেখবেন না। রোজীর মাকে বলেছেন, 'যদি ওই মেয়ের সাথে কোনদিন কথা বলতে দেখি তোমাকে— ওইদিনই আমার মরা মুখ দেখবে।'

বিয়ের পরপরই ফ্লোরা রোজমেরী হোস্টেল ছেড়ে সীমান্তর বাড়িতে উঠেছিল। তাও আজ প্রায় দু'বছর হতে চলেছে। সীমান্তর কোন পিছুটান নেই। ছেলেবেলায় বাবা-মাকে হারিয়েছে সে। তার কোন ভাই-বোনও নেই। এক মামা ওকে মানুষ করেছেন। বিপত্নীক ভদ্রলোকটি হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন পাঁচ বছর আগে। তাঁর বেশ কিছু সহায়-সম্পত্তি ছিল। সব একমাত্র ভাগ্নের নামে উইল করে দিয়ে গেছেন। মামার বাড়ি এবং জমি বিক্রি করে দিয়েছে সীমান্ত। গ্রামের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে চায়নি সে। আসল মানুষটাই যখন নেই, ওখানে গিয়ে কি লাভ? জমি বিক্রির মোটা অঙ্কের একটা টাকা সীমান্তর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা আছে। ওখান থেকে মাসে সে যে পরিমাণ সুদ পায় তার অঙ্কটা দশের কাছাকাছি।

ফ্লোরা রোজমেরী সীমান্ত হাসানের ডিপার্টমেন্টেরই ছাত্রী। দু'বছরের জুনিয়র। চৌকস ছাত্র হিসেবে খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা কোনটারই অভাব ছিল না সীমান্তর। আর রোজীর সদ্য ফোটা ফুলের মত স্নিগ্ধ লাবণ্যকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ক'টা ছেলেরই বা ছিল? সীমান্তর সাথে রোজীরই এক বান্ধবী পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তারপর নোট দিয়ে সাহায্য করার সেই গতানুগতিক গল্প। টি.এস.সিতে ঘুরে বেড়ানো, মাঝে মাঝে বেইলী রোডে গাইড হাউজে সীমান্তর নাটক দেখা। ঢাকা থিয়েটারের সাথে সীমান্ত অনেক আগে থেকে যুক্ত।

দক্ষ অভিনেতা হিসেবে অল্প-বিস্তর নামও ছড়িয়ে পড়েছিল তার। তবে টিভিতে সে সুযোগ পেয়েছে বছর দুই আগে। বরকত উল্লাহর মত প্রযোজকের নাটকে শুরুতেই প্রধান চরিত্র! নাটকটি হিট হওয়ায় মিডিয়ার চোখে পড়ে যায় সীমান্ত। প্রখ্যাত নাট্যকার কবীর হুমায়ূনের ধারাবাহিকে ছোট্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে ওর প্রতি মিডিয়ার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। এখন শুধু সীমান্ত হাসানের সামনে এগিয়ে চলার সময়।

মঞ্চ এবং টিভির ক্রমশ আগুয়ান শিল্পী সীমান্ত হাসান শূটিং বা অন্য বিশেষ কোন কাজে ব্যস্ত না থাকলে শাহবাগের সিলভানা রেস্তোরাঁয় এসে আড্ডা দেয়। অভ্যাসটা পুরানো। তবে পুরানো বন্ধু বান্ধবদের সাথে কমই দেখা হয়। তারা যে যার কাজ নিয়ে ছড়িয়ে আছে নানা জায়গায়। তবে সঙ্গীর অভাব নেই সীমান্তর। রোজীর এক দূর সম্পর্কের কাকা, আলবার্ট ডেভিড, তাদের আড্ডার মধ্যমণি। ভদ্রলোক রোজীকে নিজের মেয়ের মতই ভালবাসেন। তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন জার্মান প্রবাসী সুদর্শন এক ছেলের সাথে। মেয়ে প্রতি বছর, শীতের ছুটিতে বাবাকে এসে দেখে যায়। একটা বিদেশী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন আলবার্ট ডেভিড। অবসর জীবন-যাপন করছেন বর্তমানে। লেখালেখির অভ্যাস ছিল এককালে। পুরানো অভ্যাসটাকে এখন আবার ঝালাই করে নিচ্ছেন।

একদিন এলিফ্যান্ট রোডের ফার্নিচারের দোকানে গেছে রোজী এবং সীমান্ত, সোফা কিনবে, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আলবার্ট ডেভিডের সাথে। তিনিও ওই দোকানে কি একটা কাজে এসেছিলেন, ওদের দু'জনকে দেখে প্রায় হৈ হৈ করে উঠলেন।

'কি ব্যাপার?' অনুযোগের সুর তাঁর কণ্ঠে। 'অনেকদিন দেখি না যে তোমাদেরকে! বুড়ো মানুষটাকে ভুলে গেলে নাকি? সিলভানার আড্ডা আজ-কাল আর ভাল লাগছে না?'

'না, না। তা কেন?' প্রতিবাদ করল রোজী। 'আসলে ক'দিন ধরে আমরা খুব ব্যস্ত ছিলাম, ডেভিড আঙ্কেল। আপনাকে তো বলেছিলাম বাড়ি খুঁজছি আমরা।'

'পেয়েছ বাড়ি?'

'জ্বী। খুব সুন্দর একটা বাড়ি পেয়েছি। একেবারে মনের মত।'

'তাই নাকি? কোথায়?'

'মনিপুরী পাড়ায়। ড্রিম হাউজের একটা ফ্ল্যাট।'

'ড্রিম হাউজ!' আঁতকে উঠলেন আলবার্ট ডেভিড। 'করেছ কি তোমরা!'

'কেন?' এবার প্রশ্ন করল সীমান্ত। 'কি হয়েছে? এত নামকরা বাড়ি...'

'রাখো তোমার নামকরা! ও বাড়ির ইতিহাস জানলে আর ও পাড়ার ধারেকাছেও যেতে না। অ্যাডভান্স দিয়ে ফেলেছ নাকি?'

'জ্বী।' সামান্য অবাক হলো সীমান্ত। 'দু'মাসের অ্যাডভান্স।'

'তা হলেই হয়েছে,' হতাশ ভঙ্গিতে হাতের তালু ওল্টালেন ডেভিড।

'সমস্যাটা কি, আঙ্কেল?' ভয় পেয়েছে রোজী। 'আমরা তো বাড়িটাকে নিয়ে খারাপ কিছু শুনিনি।'

'খোঁজ-খবর নিয়েছ যে শুনবে? ও বাড়ি ভাড়া নেয়ার আগে একবার অন্তত ফোন করতে পারতে আমাকে।' উত্তেজনায় গলা চড়ে গেল তাঁর। হঠাৎ খেয়াল করলেন সবাই তাদেরকে লক্ষ করছে। ঝপ করে স্বর নামিয়ে বললেন, 'এখানের কাজ হয়েছে? তা হলে চলো কফি হাউজে গিয়ে বসি।'

এ দোকানের সোফাসেট তেমন পছন্দ হয়নি ওদের দু'জনের। সীমান্তর ইচ্ছে ছিল আরও দু'একটা দোকান ঘুরে দেখবে। নতুন বাড়িতে প্রয়াত মিসেস পলগুডার ব্যবহৃত অল্প কিছু আসবাব ওরা রেখে দেবে ঠিক করেছে। সোফাটা পছন্দ হয়নি বলে নতুন একটা

কিনতে চাইছে। ওদের বর্তমান বাসায় পান্থপথের জাহাজের দোকান থেকে কেনা এক জোড়া সোফাসেট অবশ্য আছে। বিয়ের আগে কিনে রেখেছিল সীমান্ত। কিন্তু রোজীর মতে, নতুন ফ্ল্যাটের বিশাল লিভিংরুমে ওটা একেবারে 'খ্যাত' মনে হবে। তাই সীমান্তকে আবার নতুন সোফা কিনতে হচ্ছে। বর্তমানেরটার হিল্লে পরে করা যাবে। কিন্তু এখন আলবার্ট ডেভিডের কথা শুনে সোফা কেনা মাথায় উঠল ওদের। দোকানিকে 'পরে আসব' বলে তিনজনে মিলে রাস্তা ক্রস করে কফি হাউজের দোতলায় উঠে গেল।

মাত্র সাঁঝ ঘনিয়েছে। পূর্ণ হতে শুরু করেছে কফি হাউজ। ভাগ্যক্রমে কোনার দিকে একটা ফাঁকা টেবিল মিলে গেল। আলুভাজা আর কফির অর্ডার দিয়ে ওদের দিকে ঝুঁকে এলেন আলবার্ট ডেভিড।

'আমাকে না জানিয়ে অন্যায় একটা কাজ করে বসেছ তোমরা,' চোখের মণি ঘোরালেন তিনি।

'কিন্তু ড্রিম হাউজের এত প্রশংসা শুনেছি আমরা!' ক্ষীণ প্রতিবাদ করল রোজী। 'বাড়িটা সত্যি সুন্দর। বিদেশী ছবির মত। যেন স্বপ্ন পুরী!'

'রাখো তোমার স্বপ্ন পুরী!' ধমক দিয়ে উঠলেন আলবার্ট ডেভিড। 'ওটার নাম ড্রিম হাউজ না হয়ে হওয়া উচিত ছিল হন্টেড হাউজ—প্রেতপুরী।'

'আপনি কিন্তু তখন থেকে শুধু রহস্য করেই যাচ্ছেন,' হাসল সীমান্ত। আধো আলো, আধো অন্ধকারের মাঝেও রোজীর চেহারার ফ্যাকাসে ভাবটা তার নজর এড়ায়নি। মেয়েটা অল্পতেই কি ভয় পায়! অবাক হয়ে ভাবল সে।

'রহস্য নয়। এবার সত্যি কথাটাই বলছি। ও বাড়ির মালিক কে জানো?'

'শুনেছি চার্চের তত্ত্বাবধানে আছে বাড়িটা…'

'চার্চ ড্রিম হাউজের আসল মালিক নয়। আসল ম্যালিকের নাম ক্লেমেন্ট গোমেজ। লোকটা ছিল প্রেত সাধক।'

'কি!' আঁতকে উঠল রোজী।

'তবে আর কি বলছি। আগে তিনতলা ছিল ড্রিম হাউজ। পরে ভেঙে আটতলা করা হয়েছে, সেই সাথে যোগ হয়েছে সমস্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা।'

'আচ্ছা!' কৌতূহলী দেখাল সীমান্তকে। 'এক প্রেত সাধকের বাড়ি পবিত্র চার্চের হাতে গেল কি করে? গোমেজ বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছিল নাকি চার্চের কাছে?'

'না। মোবারক হোসেন ফোকটে বাড়িটা পেয়ে যায়। ক্লেমেন্ট গোমেজের প্রতিবেশী ছিল সে। শিশু হত্যার অভিযোগ আছে ক্লেমেন্টের বিরুদ্ধে। তার বাড়ির বেযমেন্টে শিশুর রক্তমাখা লাশ পাওয়া গিয়েছিল।'

'সে কি!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল রোজীর।

'হ্যাঁ। তবে তার বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস ছিল না কারও। রাজাকার মোবারক হোসেনের দোস্ত ছিল সে! লোকের ধারণা, প্রেত সাধনা করত ক্লেমেন্ট। রাত-বিরেতে শিশু কণ্ঠের আর্তচিৎকার শুনেছে অনেকেই। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কে বা কারা তাকে বাড়ির আঙ্গিনায় জবাই করে রেখে যায়।'

'কেন?' প্রশ্ন করল সীমান্ত।

'পাকিস্তানীদের সাথে আঁতাত ছিল নাকি গোমেজের। জিগরী দোস্ত মোবারক ছিল পাড়ার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। ক্লেমেন্টকে সরাসরি কেউ রাজাকারী করতে দেখেনি। তবে পাক-আর্মির দু'একজন ক্যাপ্টেন বা মেজরকে নিয়ে তার বাড়িতে মোবারক হোসেন মাঝে মাঝে শলা-পরামর্শ করতে ঢুকছে, এমন দৃশ্য দেখেছে অনেকেই। হয়তো বকলম মোবারকের দোভাষীর কাজ করেছে গোমেজ। উর্দু নাকি খুব ভাল বলতে পারত লোকটা।'

'কারা খুন করেছে ক্লেমেন্ট গোমেজকে?' জানতে চাইল রোজী।

'শুনেছি মুক্তিযোদ্ধারা।'

'আর রাজাকার লোকটার কি হলো?'

'ঢাকা ফল করার আভাস পেয়ে সে আগেভাগে কেটে পড়ে। বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে ছিল মোবারক হোসেন চৌধুরী। তারপর সুযোগ বুঝে স্বাধীনতা পরবর্তী ভোল পাল্টানোদের দলে একদিন মিশে যায় সে। এক সময় ড্রিম হাউজের মালিক হয়ে বসে।'

'কি করে?'

'ভাড়াটে লোক দিয়ে সে পাড়াময় চাউর করে দেয় মৃত্যুর আগে ক্লেমেন্ট কানাডা ভেগে যাবার তাল করেছিল। মৃত্যুর আগে নাকি বেশ কয়েকবার খুনের হুমকি পেয়েছিল ক্লেমেন্ট। সাদা কাফন এবং দশটা টাকা প্যাকেট করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল তার কাছে। তাই সে দেশের বাইরে চলে যেতে চেয়েছিল। ড্রিম হাউজ বিক্রির ব্যবস্থাও করে ফেলে। মোবারক হোসেন বাড়িটা কেনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়। তার পরপরই ওই মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটে। তবে অনেকের ধারণা, মোবারকই ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে ক্লেমেন্টকে খুন করিয়েছে বিনে পয়সায় বাড়ির মালিক হবার অভিলাষে।'

'সে বাড়ি বিক্রির কথা বলল আর সবাই সে কথা বিশ্বাস করে ফেলল? কোন এনকোয়ারি হলো না?' সীমান্তর কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'রাখো তোমার এনকোয়ারি!' দাবড়ে উঠলেন ডেভিড। 'কার অত দায় পড়েছে কোয়ারি চালাবে? মোবারক দু'একজনকে চুক্তিপত্র দেখিয়েছে। তারা তাতে কোন ফাঁক-ফোকর পায়নি। তবে গোমেজের সইটা যে জাল তা প্রমাণ হয়ে পড়ে।'

'কি করে?'

'মোবারকের মৃত্যুর পরে। তার কোন উত্তরাধিকার ছিল না। তবে গোমেজের যুবা বয়সের একটি ছেলে ছিল। বিদেশে

পড়াশোনা করত। স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে দেশে ফিরে আসে। রাজাকারদের সঙ্গে তারও নাকি যোগসাজশ ছিল। পিতার করুণ মৃত্যুতে ভয় পেয়ে সে আবার বিদেশে পাড়ি জমায়। আর ফিরে আসেনি। শেষে চার্চ বাড়িটার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিয়ে নেয় সরকারের কাছ থেকে। একশো বছরের লিজ।'

'আপনি এত কিছু জানলেন কি করে?' অবাক হয়েছে রোজী।

'মনিপুরী পাড়ায় আমার এক বন্ধু থাকে।' জবাব দিলেন ডেভিড। 'সে-ই আমাকে গল্পটা বলেছে।'

'বুঝলাম সবই,' বলল সীমান্ত হাসান। 'কিন্তু এর মধ্যে ভয় বা আতঙ্কের তো কিছু পেলাম না। ক্লেমেন্ট গোমেজ যদি প্রেত সাধনা করেই থাকে, তাও তো তার মৃত্যুর সাথে ছাব্বিশ/সাতাশ বছর আগে চুকেবুকে গেছে। এখন ও বাড়িতে বাস করতে সমস্যা কি?'

'সমস্যা হলো ও বাড়িতে মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক সব ঘটনা ঘটে।'

'যেমন?'

'এ পর্যন্ত অন্তত চারটে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে ড্রিম হাউজে। খুনও হয়েছে দু'একজন।'

'এতই যদি বদনাম বাড়িটার তাহলে ওখানে ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া এত দুর্লভ কেন?' সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে বসল সীমান্ত। 'কেন ভাড়াটেরা ও বাড়িতে একবার উঠলে আর নামার চিন্তা-ভাবনা করে না?'

ঠাণ্ডা চোখে ওকে দেখলেন আলবার্ট ডেভিড। তারপর মৃদু গলায় বললেন, 'একটা বাচ্চা ছেলেও এ প্রশ্নের জবাব জানে। তার আগে আমাকে বলো তোমরা কেন ও বাড়ি ভাড়া নিয়েছ?'

'ফ্ল্যাটটা খুব সুন্দর। তাছাড়া অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি ভাড়াও অত্যন্ত কম।' তড়বড় করে বলল রোজী।

'ওই কারণেই সবাই ড্রিম হাউজে ঘর ভাড়া পাবার জন্য মুখিয়ে

থাকে। অবশ্য আমার জানা মতে, গত পাঁচ বছরে ড্রিম হাউজে নতুন কোন ভাড়াটে ওঠেনি। এখন তোমরা উঠতে যাচ্ছ।'

'সামনের মাসের এক তারিখে উঠব,' সাড়ম্বরে ঘোষণা করল সীমান্ত। 'পরে ফ্ল্যাটটা কিনে ফেলার ইচ্ছেও আছে আমাদের।'

'ঠিক আছে। যা খুশি করো তোমরা,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন আলবার্ট ডেভিড। 'তবে একটু সাবধানে থেকো। বিপদ-আপদ ঘটতে পারে।'

'কেমন বিপদ?' কৌতুক বোধ করছে সীমান্ত।

'লোকে বলে ক্লেমেন্ট গোমেজের অতৃপ্ত আত্মা নাকি এখনও ও বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। মোবারক হোসেন চৌধুরী নাকি তার বীভৎস, বিদেহীরূপ দেখে হার্টফেল করে মারা গেছে। তার একমাত্র ছেলেটাও কলেজ থেকে ফেরার পথে কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়।'

'ব্যস, ব্যস,' অট্টহাসি করে উঠল সীমান্ত। 'আর ভয় দেখাবেন না। ওই দেখুন, আপনার ভাই-ঝি'র চেহারা আবার কালো হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ভয়ের কিছু নেই, রোজ। আমি আছি তোমার পাশে। গোমেজের ভূত ধারে কাছেও আসতে পারবে না। উল্টো ওরই ঘাড় মটকে দেব।'

'আঙ্কেল, মোবারক হোসেনের মৃত্যুর পরে কি হলো?' আস্তে করে জানতে চাইল রোজী। তার আঙ্কেলকে সে চেনে। ফালতু কথা বলার লোক তিনি নন। একারণেই একটু ভয় ভয় লাগছে ওর।'

'মোবারক হোসেন চৌধুরীর মৃত্যুর পরে ব্যাংক-লোন নিয়ে চার্চই আটতলা বাড়িটা করে ভিক্টোরিয়ান স্টাইলে। বাড়ি ভাড়া দিয়ে চার্চের খরচ যোগানো হয়।'

'বেশ! বেশ!' হাসি হাসি মুখ করে বলল সীমান্ত। 'চার্চের নিরাপদ ছায়ায় থাকব আমরা। ভূতের গ্র্যান্ডফাদারও কিছু করতে

পারবে না আমাদের।'

'ও বাড়ির লোকজন সম্পর্কে কিছু জানেন, আঙ্কেল?' জিজ্ঞেস করল রোজী।

'খ্রিস্টান পাড়া তো! বেশিরভাগ ক্রিশ্চিয়ান ফ্যামিলির বাস। নাহ্, এদের সম্পর্কে কোন খারাপ রিপোর্ট আমার কানে আসেনি।'

'তবে যে বললেন কয়েকজন আত্মহত্যা করেছে? খুন-টুনও নাকি হয়েছে?'

'ওসব বেশ আগের ঘটনা। সম্প্রতি এ ধরনের কোন ঘটনা কানে আসেনি আমার।'

'তাহলে আমাদের খামোকা ভয় দেখালেন কেন?' ছদ্ম রাগে মুখ ভেংচাল সীমান্ত।

'ভয় দেখাইনি। সতর্ক করে দিয়েছি। কলজে খেকো খলিলুল্লাহ'র কথা তো শুনেছ। ওকে নাকি ওই বাড়ির সামনে বেশ কয়েকদিন ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে।'

আবার অট্টহাসিতে বিস্ফোরিত হলো সীমান্ত। 'খলিলুল্লাহ্র লেটেস্ট খবর আপনি জানেন, আঙ্কেল? সে ওসব কাজ ছেড়ে দিয়ে এখন ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। এখন আর কলজে খায় না খলিলুল্লাহ। ভাত-মাছ খায়। এনিওয়ে, অনেক গল্প হলো, আঙ্কেল। এখন বাড়ি ফেরা দরকার। আজ আমার একটা নাটক আছে টিভিতে। দেখবেন? তা হলে আমাদের বাসায় চলুন। একসাথে নাটকটা দেখব'খন।'

'আজ থাক।' সীমান্ত তাঁর কথা আমল দেয়নি বলে আহত বোধ করছেন আলবার্ট ডেভিড। তবে ভাবটা চেহারায় ফুটতে দিলেন না তিনি। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'আরেক দিন যাব। তোমাদের নতুন বাসায় বেড়িয়ে আসব।'

'অবশ্যই আসবেন,' হেসে বলল সীমান্ত। 'ড্রিম হাউজ যে সত্যি স্বপ্নপুরী, প্রেতপুরী নয় তা নিজের চোখে দেখে আসবেন।'

তিন

ডিসেম্বরের এক তারিখে নতুন বাসায় উঠে এল রোজী এবং সীমান্ত। রোজী খুব খুশি। সে প্রায়ই শপিং-এ যাচ্ছে। এটা-ওটা কিনছে। সেদিন লিভিংরুমে রাখার জন্য গ্রীন রোডের 'আলোহা' থেকে কিনে আনল সুদৃশ্য একটি ভিক্টোরিয়ান গ্লাস ল্যাম্প। দরজা এবং জানালার জন্যে নতুন পর্দাও কিনেছে রোজী।

ব্যস্ত সীমান্ত হাসানও। নতুন একটা মঞ্চ নাটক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ওদের গ্রুপ থেকে। বিকেলে বেইলী রোডে যেতে হয় ওকে রিহার্সাল দিতে। নাটকের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা চরিত্রে আছে ও। আর টিভি নাটকের ব্যস্ততা তো আছেই। সব মিলে চমৎকার কেটে যাচ্ছে ওদের দিন।

প্রতিবেশীদের কারও সঙ্গে এখনও রোজী বা সীমান্তর পরিচয় হয়নি। তবে ওদের পাশের ফ্ল্যাটে এক মাঝ বয়সী দম্পতি থাকেন, ম্যানেজারের কাছে শুনেছে রোজমেরী। বেডরুমের দেয়ালে কান পাতলে কখনও কখনও ওঁদের কথা শোনা যায়। মাঝে মাঝে প্রৌঢ়া স্বামীকে ডাকেন, 'রবার্ট, দশটা বাজে এখনও শুয়ে পড়ছ না কেন।' বা 'তোমার জন্য চুলোয় গরম পানি বসিয়েছি। গোসলের জন্য রেডি হও!'

দম্পতিটি শনিবারের এক সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়িতে পার্টি দিলেন। বেশ রাত অবধি আমন্ত্রিত অতিথিদের হৈ-হল্লা, গান-বাজনা শোনা গেল। সীমান্ত ইতিমধ্যে আবিষ্কার করেছে এখানকার

লোকজন নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই বেশি পছন্দ করে। নইলে এখনও পর্যন্ত একজনও কেন নতুন প্রতিবেশীকে একটা 'হ্যালো' বলার সৌজন্যটুকুও দেখাল না। সে স্ত্রীকে কড়াভাবে বলে দিয়েছে রোজী যেন সেধে কারও সঙ্গে আলাপ করতে না যায়।

কিন্তু রোজী সীমান্তর নিষেধ রক্ষা করতে পারল না। বেযমেন্টে, লন্ড্রিরুমে, অভিনেত্রী শমী কায়সারকে দেখে সে একদিন দারুণ চমকে গেল এবং সেধেই আলাপ করতে গেল মেয়েটির সাথে।

বেযমেন্টে নামার জন্য একটা লিফট আছে। সার্ভিস লিফট। তবে নিচে নামার সময় ওটা মৃগী রোগীর মত এমনভাবে কাঁপতে থাকে যেন নাট-বল্টু সব ছুটে যাবে। ওটায় চড়ে নেমে এল রোজী বেযমেন্টে। এক সময় হোয়াইট ওয়াশ করা বেযমেন্টের দেয়ালগুলোর চুনকাম ঝরে গিয়ে লাল ইঁট দাঁত বের করে দেখাচ্ছে, হাঁটার সময় জুতোর খটখট শব্দ নির্জন প্যাসেজওয়েতে ভৌতিক প্রতিধ্বনি তুলল। গা শিরশির করে উঠল রোজীর। ওর মনে পড়ে গেল, এখানে, এই বেযমেন্টে, ছাব্বিশ/সাতাশ বছর আগে কাগজে মোড়ানো রক্তাক্ত শিশুর লাশ পাওয়া গিয়েছিল। কোন্ মায়ের বুক খালি করা ধন ছিল সে? তাকে কেনই বা মারা হয়েছে? নিশ্চই খুব কষ্ট পেয়ে মরেছে বাচ্চাটা!

হঠাৎ ঘাড়ের কাছে কে যেন নিশ্বাস ফেলল ফ্লোরা রোজমেরীর। দারুণ চমকে মাথা ঘোরাল সে। কেউ নেই! খামোকাই ভয় পাচ্ছি আমি, নিজেকে বোঝাল সে। তারপর পা বাড়াল ওয়াশিংরুমের দিকে।

ড্রিম হাউজের একটি বাড়তি সুবিধে হলো বেযমেন্টে একটি ওয়াশিংরুম রয়েছে। সেখানে ভাড়াটেরা ওয়াশারে জামা-কাপড় ধুতে পারে। এজন্য অল্প কিছু কয়েন খরচ করলেই চলে। বাইরে লন্ড্রিতে আর কষ্ট করে যেতে হয় না।

রোজী একটা ওয়াশারের সামনে তার কাপড়ের ঝুড়িটা রাখল। তারপর গুনে গুনে দশটা এক টাকার কয়েন ঢোকাল টেলিফোনের কয়েন বক্সের মত একটা বক্সে। সাথে সাথে চালু হয়ে গেল ওয়াশিং মেশিন। ও ঝুঁকল ঝুড়ি থেকে কাপড় নিতে, এমন সময় 'ক্যাঁ-আ-চ' শব্দ করে পেছন দিকের দরজাটা খুলে গেল। সেখানে হাজির হলো শমী কায়সার।

প্রথম দেখায় মেয়েটিকে শমী কায়সার বলেই মনে হলো রোজীর। হুবহু তার মত চেহারা। আড়ষ্ট হেসে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'মাফ করবেন,' বলল মেয়েটি, 'আমি জানতাম না এখানে আরেকজন কেউ আছেন।'

সাথে সাথে শমী কায়সারের সাথে মেয়েটির চেহারার অমিল ধরতে পারল রোজী। হাসলে শমীর গালে টোল পড়ে এবং তার ভোগ দাঁত দেখা যায়। কিন্তু এ মেয়েটির গালে কোন টোল নেই, ভোগ দাঁতও নেই।

'না, না। ঠিক আছে,' রোজীও হাসল। 'আপনি কি কাপড় ধুতে এসেছেন? আরেকটা মেশিন খালি আছে। ওই যে,' হাত তুলে দেখাল সে।

'ধন্যবাদ,' নকল শমী কায়সার খালি মেশিনটার দিকে এগিয়ে গেল। হাতে প্লাস্টিকের একটা ঝুড়ি। কয়েন বক্সে কয়েন ঢোকাতে শুরু করল। ন'টা কয়েন ঢোকানোর পরে দেখল তার কয়েন শেষ। ভুরু কুঁচকে গেল মেয়েটির। জামা-কাপড়গুলো বের করে ঝুড়িটা আতি-পাতি খুঁজল। 'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করছে সে। 'দশটা কয়েনই তো রেখেছিলাম। আরেকটা গেল কোথায়?'

'হয়তো কোথাও পড়ে-টরে গেছে,' বলল রোজী। হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। 'এই নিন। আমার কাছে আরেকটা বাড়তি কয়েন আছে।'

কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটল মেয়েটির ঠোঁটে। 'ধন্যবাদ। আপনি সাহায্য না করলে আমাকে আবার ওপরে ছুটতে হত।'

'ক'তলায় থাকেন আপনি?' জানতে চাইল রোজী।

'সাততলায়।'

'তাই নাকি? আমিও সাততলায় থাকি। আপনাদের ফ্ল্যাট নম্বর কত?'

'সেভেন-এ।'

'আরে! আমরা তো পাশের ফ্ল্যাটেই থাকি। কিন্তু আপনাকে এর আগে দেখিনি তো!'

'একটা কাজে কয়েকদিনের জন্য ঢাকার বাইরে গিয়েছিলাম। আজ সকালে ফিরেছি।'

চোখের তারা নাচাল রোজী। 'আমি রোজমেরী হাসান। আপনি শমী কায়সারের কিছু হন-টন নাকি?'

শব্দ করে হেসে উঠল মেয়েটি। 'প্রথম দেখায় এই ভুলটা সবাই করে। শমী কায়সারকে আমি আজতক মুখোমুখি দেখিনি, আত্মীয়তা দূরে থাক। আমার নাম শীলা। আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন। আপনার চেয়ে বয়সে কত ছোট আমি!'

'তা না হয় বলব। আচ্ছা, মি. রবার্ট তোমার কে হন, শীলা?'

'রক্তের সম্পর্কের কেউ না। তবে উনি এবং মিনি আন্টি দু'জনেই আমার কাছে বাবা-মা'র চেয়েও বেশি।'

'যদি কিছু মনে না করো একটা কথা জানতে চাই—তুমি কি ওঁদের সঙ্গে সাব-লেট থাকো?'

'না না। তা কেন? ওঁরা আমাকে দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন। না হলে এতদিনে কোথায় ভেসে যেতাম!'

'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না...'

'আপনাকে পরে বলব। ভাল কথা, আপনি কি প্রায়ই আসেন এখানে?'

'না। চারদিন পর পর। কেন?'

'পরের বার আসার সময় আমাকে নিয়ে আসবেন, প্লীজ? এই জায়গাটায় আমার খুব ভয় করে। বাধ্য হয়ে একা আসতে হয়।'

'বেশ তো! পরেরবার তোমাকে নিয়েই না হয় আসব। কিন্তু তোমাকে পাব কোথায়?'

'আমাদের বেল টিপলেই চলে আসব।'

'তাহলে ভালই হবে। আমারও এই ভূতুড়ে জায়গায় একা আসতে গা ছমছম করে।'

খুশি হয়ে গেল শীলা। কি যেন বলার জন্য মুখ খুলল, চেহারা উদ্ভাসিত হলো হাসিতে। 'আমার সাথে অবশ্য একটা জিনিস আছে। এটা সাথে থাকলে আমাদের কারও কোন ক্ষতি হবে না।' কামিজের ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে রূপোর একটা চেন বের করল সে, কারুকাজ করা একটা ছোট্ট বল ঝুলছে ওটার মাঝখানে, এক ইঞ্চিরও কম হবে ব্যাসার্ধ।

'সুন্দর তো!' বলল রোজী।

'মিনি আন্টি দিয়েছেন। ওটা নাকি তিনশো বছরের পুরানো। বলটার ভেতরে কিছু ভেষজ আছে। লতা-পাতাগুলো আন্টি তাঁর টবে জন্মিয়েছেন।'

বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝখানে বলটা আলতো করে ধরে আছে শীলা। ভালমত ওটাকে দেখার জন্য ঝুঁকল রোজী। বলের মাথা থেকে বাদামী-সবুজ রঙের স্পঞ্জ জাতীয় কি একটা জিনিস বেরিয়ে রয়েছে। নাকে একটা বোটকা গন্ধ ঝাপটা মারল রোজীর। পিছিয়ে এল সে।

শীলা হাসল আবার। 'গন্ধটা প্রথম প্রথম আমারও খারাপ লাগত। এখন সয়ে গেছে।'

'এরকম জিনিস কখনও দেখিনি আমি,' স্বীকার করল রোজী। 'তোমার চেনের বলটা সত্যি সুন্দর।'

'এটা ইউরোপ থেকে আনা।' বলল শীলা। একটা ওয়াশিং মেশিনের গায়ে নিতম্ব ঠেকাল, দু'আঙুলে ঘোরাচ্ছে বলটা। প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছে। 'আসলে রবার্ট আঙ্কেল আর মিনি আন্টির তুলনাই হয় না। আমার বাবা-মা নেই। বড় হয়েছি একটা এতিমখানায়। একটা গার্মেন্টসে সুপারভাইজারের কাজ করতাম। থাকতাম নীলক্ষেতে, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে। কিন্তু গার্মেন্টস মালিক একদিন আমার ওপর অন্যায় সুযোগ নিতে চাইলে আমি চাকরি ছেড়ে চলে আসি। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম গভর্নেসের কাজ করব। রবার্ট আঙ্কেল তারপর আমার সাথে যোগাযোগ করেন। বলেন দুই বুড়ো-বুড়ির সেবা-যত্ন করতে হবে। মাস গেলে মোটা বেতন। রাজি হয়ে যাই আমি। পরে দেখি আঙ্কেল আর আন্টির ফাই-ফরমাশ খাটার জন্য এ বাড়িতে নিয়ে এসেছেন তিনি। তবে আমার সঙ্গে ওঁরা মোটেই চাকর-বাকরের মত ব্যবহার করেন না। যেন আমি ওঁদের আপন মেয়ে।'

কথা বলতে বলতে আনমনা হয়ে গিয়েছিল শীলা, হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল। 'এই দেখুন। প্রথম পরিচয়েই আপনাকে আমার দুঃখের পাঁচালী শুনিয়ে বসলাম! আসলে আমি মোটেই পেটে কথা গোপন রাখতে পারি না।'

ওর কাঁধে একটা হাত রাখল রোজী। 'দুঃখের কথা কাউকে না কাউকে বলতে হয়। তাহলে হালকা হয়ে যায় মন।'

'আমি কিন্তু এখানে ভালই আছি,' বলল শীলা। 'গার্মেন্টসের ওই নোংরা অভিজ্ঞতার পরে প্রথম প্রথম একটু ভয়েই ছিলাম। কিন্তু পরে দেখলাম আঙ্কেলের মত মানুষই হয় না। আমার সমস্ত সুবিধে অসুবিধের দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। শুনেছি উনি আমাকে কলেজে ভর্তি করাবেন। জানেন, আমার খুব ইচ্ছে কলেজে পড়ার। তারপর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হব। শেষে নিজের পায়ে দাঁড়াব একদিন...' আবার উদাসী হয়ে উঠল শীলার টলটলে, কালো চোখ জোড়া।

তার কাঁধের ওপর রোজীর হাতের চাপ বাড়ল। 'নিশ্চই দাঁড়াবে,' বলল সে। 'খুব গভীর ভাবে কামনা করলে মানুষের কোন ইচ্ছেই অপূর্ণ থাকে না।'

চার

দিন পনেরোর পরের ঘটনা।

রোজী আর সীমান্ত বেইলী রোড থেকে বাড়ি ফিরছে। সীমান্ত'র নতুন নাটক 'যেখানে সীমান্ত তোমার'-এর রিহার্সাল দেখতে গিয়েছিল রোজী। মোড়ের কাছাকাছি আসতে ওদের দু'জনেরই ভুরু কুঁচকে গেল। ড্রিম হাউজের সামনে পুলিশের গাড়ি কেন? মানুষজনের ভিড়ও দেখা যাচ্ছে। রোজী লক্ষ করল বিভিন্ন ফ্ল্যাটের বারান্দা এবং জানালা দিয়ে উৎসুক মুখ উঁকি দিচ্ছে নিচে। ওরা রিকশা ছেড়ে দিল গলির মোড়ে। হেঁটে এগোল বাড়ির দিকে।

গ্যারেজের পাশে একটা ফোক্সওয়াগন দাঁড় করানো। দেখে মনে হয় ঝড় বয়ে গেছে ওটার ওপর দিয়ে। গাড়িটার নরম ছাদ একদিকে তোবড়ানো; উইন্ডশিল্ড ফেটে চুরমার, মাকড়সার জালের মত অসংখ্য ফাটল।

'মরে একেবারে ভূত হয়ে গেছে,' কে যেন মন্তব্য করল ভিড়ের মধ্যে থেকে। 'দেখলাম আকাশ থেকে পড়তে শুরু করেছে। সোজা এসে পড়ল গাড়িটার ওপরে।'

ভিড় ঠেলে সামনে এগোতে পারছে না রোজী এবং সীমান্ত।

বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করল বকের মত। এমন সময় এক পুলিশ অফিসার খেঁকিয়ে উঠল, 'দেখি, দেখি। ভিড় কমান!' হাতের ডাণ্ডাটা উঁচু করে ধরতেই দুদ্দাড় করে পিছিয়ে এল কৌতূহলী দর্শকদের দঙ্গলটা, ছত্রখান হয়ে গেল। এবার দৃশ্যটা দেখতে পেল ওরা। ফুটপাথের ওপর চিৎ হয়ে আছে শীলা, খোলা একটা চোখ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। অন্য চোখটি এবং মুখের আধখানা রক্তে ভেসে গেছে। গায়ে সাদা একটা চাদর। কাপড়টা রক্তে লাল।

শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল রোজী, দ্রুত ক্রস আঁকল বুকে। জোর করে দাঁতে দাঁত চেপে রাখল, অনেক কষ্টে পেট ঠেলে আসা বমি চেপে রাখছে।

'ইয়াল্লা!' ফিসফিস করে বলল সীমান্ত। শীলাকে চেনে সে। স্ত্রীর কাছে অসহায় মেয়েটার গল্প শুনেছে।

'কি ব্যাপার? এখনও দাঁড়িয়ে আছেন যে?' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল পুলিশ অফিসার। 'যান যান।' কাজে ডিস্টার্ব করবেন না তো!'

'মেয়েটাকে আমরা চিনি,' বলল সীমান্ত। ফোক্সওয়াগনের পাশে দাঁড়িয়ে আরেক পুলিশ অফিসার নোট বুকে কি যেন লিখছিল। সে এবার ঘুরে তাকাল, 'কি নাম ওর?'

'শীলা।'

'শীলা কি? পদবী কি?' জানতে চাইল মোটা লোকটা। মোটা পুলওভার গায়ে, তারপরও শীতে কাঁপছে ঠক ঠক করে। জিজ্ঞেস করল সীমান্ত, 'রোজ, শীলার পুরো নাম কি?'

চোখ খুলে ঢোক গিলল রোজী। 'পুরো নাম জানি না। বলেনি আমাকে।'

মোটা পুলিশ অফিসারকে সীমান্ত বলল, 'মেয়েটা রবার্ট ডি সুজা নামে এক লোকের আশ্রয়ে থাকত। তার অ্যাপার্টমেন্ট নম্বর সেভেন-

এ।'

'সে খবর আমরা জানি,' নিরাসক্ত শোনাল মোটুর গলা। হাত নেড়ে ডাকল মি. স্টিফেন গনজালেসকে। তিনি সুদৃশ্য একটি শাল গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন গ্যারেজের পাশে। দ্রুত এগিয়ে এলেন পুলিশ অফিসারের দিকে। এক টুকরো হলুদ রঙের কাগজ দিল সে গনজালেসের হাতে। 'এটা জানালার সাথে টেপ দিয়ে আটকানো ছিল,' বলল পুলিশ অফিসার। 'ফলে বাতাসে উড়ে যেতে পারেনি।'

কাগজের লেখাটা পড়লেন গনজালের্স। 'শীলা রোজারিও ডি কস্টা।'

'চেনেন না মেয়েটাকে?' অনুসন্ধিৎসুদৃষ্টিতে তাকাল পুলিশ অফিসার।

'দেখেছি দু'একদিন। শুনেছি মি. রবার্টের কাছে গভর্নেসের চাকরি নিয়েছে। এর বেশি কিছু জানি না,' বললেন স্টিফেন গনজালেস।

'আপনারা?' রোজীর দিকে ফিরল অফিসার।

'বেযমেন্টে পরিচয় হয়েছিল শীলার সাথে,' বলল রোজী। 'তারপর একদিন লিফটে দেখা হয়। ব্যস্ত ছিলাম আমি। তাই কথা হয়নি। ব্যস, এটুকুই।'

'রবার্ট ডি সুজা সম্পর্কে কি জানেন?'

'কিছুই জানি না,' এবার জবাব দিল সীমান্ত।

'ভদ্রলোকের চেহারা পর্যন্ত দেখিনি। ঘর থেকে বেরই তো হন না কখনও।'

'ওদের কোথায় পাব বলতে পারবেন?'

ঘড়িতে চোখ বোলাল রোজী। রাত সাড়ে দশটা। 'এখন তো ঘরেই থাকার কথা। এ সময়টাতে শুয়ে পড়েন দু'জনেই। ওঁদের বেডরূম আর আমাদের বেডরূম পাশাপাশি। কাজেই প্রায় সব কথাই পরিষ্কার শোনা যায়।'

'কেন, যাননি এখনও ওঁদের ফ্ল্যাটে?' জানতে চাইল সীমান্ত। জবাব দিল না অফিসার। মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে থাকল।

হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলে উঠলেন মি. গনজালেস, 'ওই যে আসছেন ওঁরা!' মাথা ঘুরিয়ে তাকাল রোজী ও সীমান্ত। মোড় ঘুরে এদিকেই আসছেন ওঁরা দু'জন। ভদ্রলোক বেশ লম্বা, চওড়া কাঁধ, মাথার কাঁচা-পাকা চুলগুলো আর্মি ছাঁট দেয়া। বয়স ষাটের কোঠায়। মুখের ফ্রেঞ্চকাট দাড়িগুলো পেকে সাদা হয়ে আছে। তাঁর সঙ্গিনী বেঁটেখাট, ফর্সা। পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন বছর হবেন তিনি। হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হয় শরীরে তাগদ প্রচুর। হাত ধরাধরি করে হাঁটছিলেন দু'জনে, বাড়ির সামনে পুলিশ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'মি. সুজা!' হেঁড়ে গলায় ডাকলেন গনজালেস। 'এদিকে আসুন, প্লীজ। পুলিশ কথা বলবে আপনাদের সঙ্গে।'

পা চালালেন স্বামী-স্ত্রী, ভঙ্গিটা আড়ষ্ট। বোঝা যায় অসময়ে পুলিশ দেখে অবাক হয়েছেন, এত রাতে আইনের রক্ষকরা কথা বলবে শুনে হয়তো মনে মনে অপ্রস্তুতও।

ওঁরা সামনে এলে মোটু অফিসার গমগমে গলায় বলল, 'আপনারা সাততলায় থাকেন?'

'জ্বী,' শুকনো গলায় এত আস্তে জবাবটা দিলেন মি. সুজা যে শুনতে কষ্টই হলো রোজীর।

'শীলা রোজারিও ডি কস্টা নামে একটা মেয়ে আপনাদের সঙ্গে থাকত?'

'হ্যাঁ,' বললেন মি. রবার্ট। 'কেন কি হয়েছে? অ্যাক্সিডেন্ট করেনি তো?' শেষের দিকে তাঁর স্বর ভাঙা শোনাল।

'তার চেয়েও খারাপ খবর আছে আপনাদের জন্য, মি. সুজা,' বলল অফিসার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখ দুটো পরীক্ষা করল। তারপর যোগ করল, 'মারা গেছে মেয়েটা। আত্মহত্যা করেছে।' হাত তুলে কাঁধের ওপর দিয়ে পেছন দিকে নির্দেশ করল, 'জানালা দিয়ে

লাফিয়ে পড়েছে শীলা।'

পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ওঁরা, চেহারা ভাবলেশহীন, যেন শুনতে পাননি কিছুই; তারপর মিসেস ডি সুজা চোখ ফেরালেন ফুটপাথে, অফিসারের পেছনে সাদা কাপড়ে ঢাকা লাশটার দিকে ঝুঁকলেন, আবার সিধে হলেন, চোখে চোখ রাখলেন মোটা লোকটির। 'এ অসম্ভব,' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'এ কিছুতেই হতে পারে না। ওটা শীলা নয়। অন্য কেউ।' পুলিশ অফিসার তার সঙ্গীর দিকে না ফিরেই বলল, 'হামিদ, ওঁদের লাশটা ভালভাবে দেখতে দাও।'

মিসেস ডি সুজা অফিসারের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন, দাঁতে দাঁত চেপে আছেন। ফলে উঁচু হয়ে আছে চোয়াল জোড়া।

মি. ডি সুজা তাঁর জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকলেন। বললেন, 'জানতাম এমন কিছু একটা ঘটবে। ওকে মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে উঠতে দেখেছি আমি। মিনিকে কথাটা বললেও সে গ্রাহ্য করেনি। মানুষ যা চায় তা সবসময় পায় না, এ ধরনের মতবাদে ওর বিশ্বাস নেই। সাংঘাতিক অপটিমিস্ট আমার স্ত্রী।'

মিসেস ডি সুজা ফিরে এসেছেন আবার। 'শীলা আত্মহত্যা করেছে বিশ্বাস হয় না আমার,' বললেন তিনি। 'খুব ভাল মেয়ে ছিল শীলা। জীবন নিয়ে আশাবাদী ছিল। নিজেকে ও ধ্বংস করতে যাবে কোন্ দুঃখে? এটা দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। হয়তো জানালার কাঁচ পরিষ্কার করতে গিয়েছিল, তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেছে নিচে। ঘর-দোর ধোয়া-মোছার কাজ করতে খুব পছন্দ করত মেয়েটা।'

'তাই বলে রাত দুপুরে নিশ্চই শীলা জানালা পরিষ্কার করতে যায়নি,' বললেন রবার্ট।

'কেন যাবে না?' রাগে গরগর করে উঠলেন মিসেস ডি সুজা। 'নিশ্চই গিয়েছিল।'

পুলিশ অফিসার তার নোট বই খুলে হলদে রঙের একটা কাগজ বের করল। বাড়িয়ে দিল মিসেসের দিকে।

একটু ইতস্তত করলেন মিসেস ডি সুজা, তারপর টুকরোটা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। মি. ডি সুজা সামান্য নুয়ে লেখাটা একই সাথে পড়লেন। তাঁর পাতলা ঠোঁট জোড়া কাঁপতে লাগল।

'মেয়েটার হাতের লেখাই তো?' জিজ্ঞেস করল অফিসার।

মাথা নাড়লেন মিসেস ডি সুজা। রবার্ট বললেন, 'অবশ্যই তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

কাগজটা মিসেস ডি সুজার হাত থেকে নিয়ে অফিসার বলল, 'আমাদের কাজ শেষ হলে এটা আবার ফেরত পাবেন।'

মিসেস ডি সুজা চোখ থেকে চশমা খুললেন, ঘাড়ের সাথে বাঁধা চেনে ওটা ঝুলতে লাগল বুকের ওপর, দু'হাতে চোখ ঢেকে তিনি বলতে লাগলেন, 'ঘটনাটা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। শীলা এত আনন্দময়ী ছিল! ও কেন এ কাজ করতে যাবে?' মি. রবার্ট স্ত্রীর কাঁধে একটা হাত রেখে চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন মাটির দিকে।

'মেয়েটার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?' জানতে চাইল অফিসার।

'ওর আপনজন বলতে কেউ ছিল না,' জবাব দিলেন মিসেস ডি সুজা। 'আমরাই ছিলাম ওর একমাত্র আপনজন।' ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি।

'এতিমখানায় মানুষ হয়েছিল শীলা,' মৃদু গলায় বলল রোজী। 'আমাকে বলেছিল এ কথা।'

'তাই নাকি?' বলল অফিসার। 'কোন্ এতিমখানায়?'

নামটা বললেন রবার্ট ডি সুজা।

'ধন্যবাদ। আমি ওখানে একবার খোঁজ নেব। ঠিক আছে, আপনারা এখন যেতে পারেন। ভাল কথা, রবার্ট সাহেব, আপনারা কোত্থেকে ফিরলেন এত রাতে?'

'মিরপুরে এক আত্মীয়র বাসায় গিয়েছিলাম। খেয়েদেয়ে

আসতে দেরি হয়ে গেল।'

'ও, আচ্ছা! এনিওয়ে, লাশটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি। পোস্ট মর্টেম করতে হবে। আপনারা এর মধ্যে ঢাকা ছেড়ে কোথাও যাবেন না। যদিও ক্লিন সুইসাইড বোঝা যাচ্ছে। তবু আরও ইনভেস্টিগেশনের প্রয়োজন হলে আপনাদেরকে দরকার হতে পারে।'

'আমরা এমনিতেও কোথাও তেমন যাই না। আর এখন তো যাবার প্রশ্নই ওঠে না,' বললেন মি. রবার্ট।

'এ নিয়ম কি আমাদের জন্যেও প্রযোজ্য?' জিজ্ঞেস করল সীমান্ত। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ওর পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে।

'না, না। আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মত মুভ করতে পারেন।'

ঘরে ঢুকে সোফায় কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল ফ্লোরা রোজমেরী। ঘটনাটা এখনও বিশ্বাস করতে সায় দিচ্ছে না মন। মাত্র হপ্তা দুই আগে পরিচয়। এরইমধ্যে তরতাজা একটা প্রাণ এভাবে ঝরে গেল? কিন্তু আত্মহত্যা করবে কেন শীলা? ওর চোখে যে উদ্দীপনা লক্ষ করেছে রোজমেরী তাতে কিছুতেই ব্যাপারটা মেলাতে পারছে না। এর ভেতরে অন্য কোন রহস্য নেই তো?

'ডেভিড আঙ্কেল কি বলেছিলেন মনে আছে?' সীমান্তকে জিজ্ঞেস করল রোজী। 'এ বাড়িতে অনেক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে?'

'আহ্, রোজ,' বলল সীমান্ত, 'আবার তুমি সেই ভূতুড়ে ব্যাপারটা টেনে আনছ!'

'কিন্তু আঙ্কেল তো ঘটনাগুলো বিশ্বাস করেন।'

'তাতে কি হয়েছে? শীলা তো চিঠিতে স্বীকার করেই গেছে সে আত্মহত্যা করেছে।'

'কিন্তু আমার মন উল্টো কথা বলছে, সীমান্ত। কেমন যেন ভয় লাগছে আমার। মনে হচ্ছে আরও অশুভ কোন ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এ বাড়িকে ঘিরে।'

পাঁচ

পরদিন সকালে, ড্রইংরুমের সোফার কুশনগুলো ঠিকঠাক করছে রোজী, এমন সময় বেজে উঠল কলিংবেল। পিপহোলে চোখ রেখে দেখল মিসেস ডি সুজা দাঁড়িয়ে আছেন।

দরজা খুলল রোজী। 'কেমন আছেন?' প্রশ্ন করল ও।

'আছি কোনরকম,' ম্লান হাসলেন তিনি। 'একটু ভেতরে আসতে পারি?'

'অবশ্যই,' সরে দাঁড়াল রোজী। একটা সোফা দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

'তোমাদের বাসায় আসলে আরও আগে আমার আসা উচিত ছিল,' একটা সোফায় বসতে বসতে বললেন মিসেস ডি সুজা। 'তোমাকে "তুমি" করেই বললাম। কিছু মনে করলে না তো?'

'না, না। অবশ্যই তুমি করে বলবেন। এতে মনে করার কি আছে?'

'শীলা বলেছিল তোমার কথা। খুব প্রশংসা করেছে তোমার। ভেবেছিলাম ওকে নিয়েই আসব তোমাদের বাড়িতে। কিন্তু মাঝ থেকে কি হতে কি হয়ে গেল!' বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রৌঢ়া।

'শীলাকে আমারও খুব ভাল লেগেছিল,' বলল রোজমেরী। 'উচ্ছল, হাসিখুশি একটা মেয়ে। আপনাদের কথা খুব বলেছে আমাকে। আপনারা নাকি ওকে আপন মেয়ের মত ভালবাসতেন।'

'জানো, ওর কোন অভাব রাখিনি আমরা। কিন্তু তারপরও কেন যে পাগলের মত এ কাজটা করতে গেল!'

'আমারও মাথায় ব্যাপারটা ঠিক ঢুকছে না। আচ্ছা, শীলার পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন?'

'আজ-কালের মধ্যেই হয়তো পেয়ে যাব। রিপোর্ট দিয়ে আর কি হবে শীলাকে তো আর ফিরে পাব না!'

কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতা। রোজী কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। শোকার্ত মানুষকে সান্ত্বনা দিতে তেমন পটু নয় সে। নিজেরই কেন জানি কান্না পেয়ে যায়। সে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। তার অবস্থা বুঝতে পেরেই হয়তো প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন মিসেস ডি সুজা। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, 'ঘরটা তো বেশ সুন্দর সাজিয়েছ তুমি!'

লাজুক হাসল রোজী। 'না, কোথায় আর সাজালাম। এখনও গুছিয়ে উঠতেই পারিনি।'

'সত্যি খুব সুন্দর লাগছে ঘরটা। এ ফ্ল্যাটে আগে আমার এক বন্ধু থাকতেন। মিসেস আভা পলগুডা।'

'জানি। শীলা বলেছিল আমাকে।'

'ও হ্যাঁ। তোমরা তো লিভিংরুমে বসে কথা বলতে।'

'লিভিংরুমে শীলার সাথে একবারই দেখা হয়েছিল আমার।'

মিসেস ডি সুজা টি-টেবিলটাকে দেখিয়ে বললেন, 'ভারি সুন্দর তো! কোত্থেকে কিনেছ?'

'পান্থপথ থেকে। জাহাজের ফার্নিচার।'

'হ্যাঁ। ওখানে তো সুন্দর সুন্দর জিনিস পাওয়া যায়। আমার হাজব্যান্ড বছর পাঁচেক আগে পান্থপথ থেকে একটা বক্স খাট কিনেছে। দেখার মত জিনিস!'

এ ধরনের আলোচনায় উৎসাহ পাচ্ছে না রোজী। তার অবাক লাগছে ভেবে শীলার মৃত্যু মহিলাকে কি তেমন নাড়া দিয়ে যায়নি?

নাকি শোক ভুলতে তিনি অন্য দিকে মনটাকে টেনে নিতে চাইছেন? তবু ভাল রোজীকে গতানুগতিক সান্ত্বনা বাণী শোনাতে হচ্ছে না।

'তোমার স্বামী কি করেন?' জিজ্ঞেস করলেন মহিলা। 'যা হ্যান্ডসাম চেহারা! রবার্টের সাথে বাজি ধরেছি সে ফিল্মে অভিনয় না করে পারেই না।'

'বাজিতে জিতে গেছেন আপনি,' মৃদু হাসল রোজী। প্রসঙ্গ পাল্টে গেছে বলে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। 'আমার স্বামী অভিনয়ই করে। তবে ফিল্মে নয়, টিভিতে। এই তো ক'দিন আগে একটা সিরিয়ালে অভিনয় করল। আপনারা নাটকটাটক দেখেন না?'

'রবার্ট ইএসপিএন আর বিবিসি ছাড়া কিছু দেখে না। আর টিভি দেখতে আমার মোটেও ভাল লাগে না।'

'তা হলে সময় কাটান কিভাবে?'

'কেটে যায় একরকম,' হাসলেন প্রৌঢ়া। 'ভাল কথা, তোমাদের বাচ্চা-কাচ্চা নেই?'

'এখনও নেই,' সলাজ হাসিটা ঠোঁটে ধরে রেখে জবাব দিল রোজী।

'তাই? এত সুন্দর দেখতে তুমি! আর এত স্বাস্থ্যবতী। তোমার তো অনেক সন্তানের মা হওয়া উচিত।'

'বাপরে!' কৃত্রিম আতঙ্কে আঁতকে উঠল রোজী। 'রক্ষা করুন। একটা বেবীই যথেষ্ট।'

'তা সেই বেবীটারই-চান্স কেমন?' চোখ নাচালেন মিসেস ডি সুজা। 'আমার কাছে কিছু লুকোতে হবে না। তোমার মা-খালার বয়সী হলেও আমি কিন্তু খুব ফ্রেন্ডলি।'

'জানি। শীলা বলেছে আমাকে।' মেঝেতে চোখ নামাল রোজী। 'আমার তো খুব ইচ্ছে এ বছরেই...'

'বেশ, বেশ। তা হলে তোমাদের জন্য আগাম অভিনন্দন

রইল।' হাসতে হাসতে বললেন মিসেস ডি সুজা। 'এবার তাহলে উঠি। নিউমার্কেটে যেতে হবে বাজার করতে।'

'সে কি! এক কাপ কফি অন্তত খেয়ে যান।'

'পরে আরেকদিন খাব। আগে তোমরা এসো আমাদের বাসায়। আমার সাহেবের সাথে পরিচিত হও। খুব মজার মানুষ বুঝলে? নিজের সাহেব বলে বলছি না!'

'যাব। নিশ্চই যাব।'

'আগামী শনিবারই চলে এসো। এক সাথে ডিনার করব, কোন অসুবিধে নেই তো?'

'আমার কোন অসুবিধে নেই। সারা দিন তো ঘরেই বসে থাকি। আচ্ছা, সীমান্ত আসুক। ওকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখি।'

সীমান্ত হাসান বাড়ি ফিরল মেজাজ খারাপ করে। একটা বহুজাতিক কোম্পানির কনডেন্সড মিল্কের বিজ্ঞাপনটা পেয়ে গেছে ওর প্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা শোভন রহমান। সীমান্তর ঘনিষ্ঠ এক সূত্র জানিয়েছে, চুক্তিপত্র এখনও কিছু হয়নি। তবে শোভনই যে বিজ্ঞাপন চিত্রটিতে অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারটি প্রায় চূড়ান্ত। কোম্পানির সম্ভাবনাময় অভিনেতাদের তালিকায় সীমান্তর নামটাও ছিল। শোভনের জনপ্রিয়তা তার চেয়ে বেশি নয়। তবে শোভনের প্লাস পয়েন্ট হলো অ্যাড ফার্মগুলোর সাথে তার লিয়াজোঁটা শক্তিশালী। এদিক থেকে পিছিয়ে আছে সীমান্ত। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। তেল মাখাতে ওস্তাদ শোভন মোটা টাকার বিজ্ঞাপনটা পেয়ে গেছে।

'মন খারাপের কিছু নেই,' ওকে সান্ত্বনা দিল রোজী। 'এরকম সুযোগ অনেক আসবে তোমার জীবনে। সামান্যতে ভেঙে পড়লে চলবে না, ডার্লিং।'

'আরে না! ভেঙে পড়ব কেন? তবে শোভন শালার ওপর খিঁচড়ে

আছে মেজাজ। জানো, অ্যাড লিয়াজোঁ-র প্রধান নির্বাহী অফিসারকে ও কিরকম তেল মাখে?'

'ওর কথা বাদ দাও। শোনো, আজ সকালে মিসেস রবার্ট এসেছিলেন আমাদের বাসায়।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তুমি বলেছিলে ওরা মোটেও মিশুক নন । কিন্তু ভদ্র মহিলাকে বেশ ভাল লেগেছে আমার।'

'আচ্ছা! তা কি বললেন তিনি?'

'সে অনেক কথা। উনি তোমাকে ডিনারের দাওয়াত দিয়েছেন।'

'একদিনের পরিচয়েই এত!'

'ঠাট্টা নয়। সত্যি। আগামী শনিবার ওঁদের বাসায় খেতে বলেছেন। আমি অবশ্য কথা দিইনি। তোমার শিডিউল না জেনে...'

'শনিবার আমি ফ্রী আছি।'

'তাহলে যাবে?'

'যাওয়া দরকার মনে করছ?'

'প্রতিবেশী মানুষ। আপদে-বিপদে কখন দরকার পড়ে ঠিক নেই।'

'ঠিক বলেছ। পরিচয় থাকা দরকার। আচ্ছা, আমার যেতে কোন আপত্তি নেই। নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হতে বরং ভালই লাগবে।'

ছয়

মি. এবং মিসেস ডি সুজাকে ভালই লাগল সীমান্ত হাসানের। দু'জনেই বেশ মিশুক এবং আন্তরিক। রোজীকে একেবারে জড়িয়ে ধরে অন্দর মহলে নিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। সীমান্তকে নিজেদের বিশাল ড্রইংরুমে সঙ্গ দিলেন মি. রবার্ট। শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আলাপ জমে উঠল দ্রুত। সীমান্ত অবাক হয়ে জানল পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যেখানে যাননি মি. রবার্ট ডি সুজা।

'পৃথিবীর প্রায় সব মহাদেশ ঘোরা হয়ে গেছে আমার,' বললেন ডি সুজা। 'জাহাজে চাকরি করতাম। সেই সুবাদে ঘুরে বেড়িয়েছি।'

'খুব ভাগ্যবান আপনি,' বলল সীমান্ত। 'আমরা ভাই কুয়োর ব্যাঙ কুয়োতেই পড়ে আছি। এখন পর্যন্ত নিজের দেশটাই ভাল মত দেখা হলো না তারপর আবার বিদেশ!'

'দেশ কোথায় আপনার?' জানতে চাইলেন ডি সুজা।

'দিনাজপুর। গিয়েছেন নিশ্চই?'

'নাহ্। যাওয়া হয়নি। আসলে দুর্ভাগ্যই বলতে পারেন। অর্ধেকেরও বেশি পৃথিবী দেখা আছে আমার, অথচ নিজের দেশটা আপনার মতই দেখা হয়ে ওঠেনি।'

'আপনার বাড়ি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সীমান্ত।

'জন্ম আমার ভারতে। দেশ ভাগের পরে এ দেশে চলে আসি। তখন আমি খুবই ছোট।'

'জাহাজে চাকরি নিয়েছেন কবে?'

'মুক্তিযুদ্ধের পরে।'

সীমান্ত আরও কি যেন প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, মিসেস ডি সুজা এসে পড়ায় বাধা পেল।

'অনেক গল্প হয়েছে,' বললেন তিনি হাসি হাসি মুখ করে। 'এখন উঠুন। খানা রেডি।'

রান্নার আয়োজন প্রচুর। গরু, খাসি, মুরগী তিন পদই আছে। সাথে কই মাছ ভাজি, চিংড়ি মালাইকারী, রুই মাছের দো-পেঁয়াজা এবং পাবদার ঝোল। কিন্তু খেতে পারল না ওরা। সব কিছুতেই কেমন একটা আঁশটে গন্ধ। যেন মাছ-মাংসগুলো না ধুয়েই রান্না করা হয়েছে। গা গুলিয়ে এলেও অনেক কষ্টে কই মাছ আর গরুর ভুনাটা নিল সীমান্ত। চিবোনোর সময় বুঝতে পারল রোজীর কত কষ্ট হচ্ছে খাবার সময় মুখে হাসি ধরে রাখতে। ও প্রায় কিছুই খাচ্ছে না দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মিসেস ডি সুজা, 'সে কি! আপনি দেখি কিছুই নিচ্ছেন না।'

সীমান্ত অপ্রস্তুত হয়ে হাসল। ওকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করল রোজী। বলল, 'আন্টি। ওর পেটটা আসলে ক'দিন ধরে ভাল যাচ্ছে না। ডাক্তার ওকে মাসখানেক গুরুপাক কোন খাবার খেতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আপনারা এত আয়োজন করেছেন...'

সহানুভূতির গলায় রবার্ট বললেন, 'তাহলে থাক, সীমান্ত সাহেব। ভদ্রতা রক্ষা করতে গিয়ে আবার নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না যেন।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সীমান্ত। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল স্ত্রীর দিকে। রোজী গলায় সহানুভূতি ফুটিয়ে বলল, 'তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?'

ফ্যাকাসে হাসি হাসল সীমান্ত। 'পেটটা বোধহয় আবার ট্রাবল দিতে শুরু করেছে।' তাকাল রবার্টের দিকে। 'যদি অনুমতি দেন আমি এখন উঠব।'

'অবশ্যই। অবশ্যই।' ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললেন ডি সুজা।

এরপর আর খাওয়া জমে কি করে? মুখ-টুখ ধোয়ার পরে মি. রবার্ট সীমান্তকে নিয়ে বসার ঘরে চলে এলেন। হাতে একটা কোকের গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিন। কোক খান। হজম হয়ে যাবে সব।'

'ধন্যবাদ,' বলে গ্লাসে চুমুক দিল সীমান্ত।

'শুনলাম আপনি অভিনয় করেন?' জিজ্ঞেস করলেন মি. রবার্ট।

'হ্যাঁ। এই টুকটাক।'

'টিভিতে পয়সা কেমন?'

'খেয়েপরে চলে যাচ্ছে।'

'ভাল। বেশ ভাল। আমাদের আটতলায় একজন ফিল্ম প্রডিউসার আছেন। সিদ্দিকী সাহেব। চেনেন?'

'না। চিনি না। আসলে কারও সাথেই এখনও তেমন পরিচয় হয়ে ওঠেনি।'

'অসুবিধে নেই। আস্তে ধীরে সবার সাথেই পরিচয় হবে। দেখবেন সবাই কি মাইডিয়ার লোক।'

ঘড়ির দিকে তাকাল সীমান্ত। প্রায় দশটা বাজে। 'যদি কিছু মনে না করেন এখন উঠতে চাই।' বলল ও।

'এখনই যাবেন? আপনার গিন্নি বোধহয় কিচেনে। আমার গিন্নিকে থালা-বাসন ধুতে সাহায্য করছেন।' মি. রবার্ট গলা চড়ালেন। 'মিনি! মিসেস হাসানকে পাঠিয়ে দাও। তাঁর কর্তা উঠতে চাইছেন।'

বাসায় ফিরে বাথরুমে ঢুকে কিছুক্ষণ 'ওয়াক! ওয়াক!' করল সীমান্ত।

ওর গলা ঠেলে বমি আসছে। কিন্তু বমি হলো না। ওর অবস্থা দেখে রোজী হেসেই খুন। বলল, 'রান্না যেমনই হোক মানুষ দুটি কিন্তু খুব আন্তরিক, তাই না?'

'আন্তরিকতার গুষ্টি মারি! শালা কতগুলো কাঁচা মাছ-মাংস খাইয়ে দিয়েছে।' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল সীমান্ত।

'তুমি তো কিছুই খাওনি। আমাকে বাধ্য হয়ে কয়েকটা ডিশ গিলতে হয়েছে। নইলে ওরা ঠিক বুঝে ফেলতেন রান্না ভাল হয়নি বলে আমরা খাচ্ছি না।'

'ওঁদের বাসায় জীবনেও আর দাওয়াতে যাব না আমি,' সাফ জানিয়ে দিল সীমান্ত।

'কিন্তু ওঁদের একদিন দাওয়াত দেয়া দরকার। আমাদের জন্য এত কিছু আয়োজন করেছেন...'

'হ্যাঁ। দিয়ো একদিন দাওয়াত। বুঝিয়ে দিয়ো রান্না কাহাকে বলে।'

সে রাতে, ঘুমাতে যাবার আগে, রান্না ঘরে দুধ গরম করছে রোজী, (ও প্রতিদিন এক গ্লাস দুধ খায় বিছানায় যাবার আগে) হঠাৎ তলপেটে চিনচিনে একটা ব্যথা উঠল, ছড়িয়ে পড়ল কোমরে। মুখ কুঁচকে গেল রোজীর, হেলান দিল রান্নাঘরের দেয়ালে। আবার শুরু হতে যাচ্ছে যন্ত্রণাদায়ক ক'টা দিন। মাসের এই বিশেষ সময়টা এলেই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে সে। কাটা মুরগীর মতই ছটফট করতে থাকে তীব্র যন্ত্রণায়। মা হবার জন্য মানসিকভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রোজী। কিন্তু সীমান্ত রাজি হচ্ছে না। সে খালি বলে, 'আরও ক'টা দিন যাক না।' নিজে কোন প্রটেকশন ব্যবহার করবে না। সহধর্মিণীকে প্রতিমাসে জন্ম নিরোধক বড়ি 'নরডেট টুয়েন্টি এইট' খেতে হবে। পিল খেতে খেতে ওর তলপেট ভারী হয়ে উঠেছে। রোজীর এক বান্ধবী ওকে বলেছে, নিয়মিত পিল খাওয়া নাকি

স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি। জরায়ু ক্যান্সার হতে পারে, সন্তান জন্মাবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ব্যথাটা আস্তে আস্তে কমে এল। ঘাম জমে গিয়েছিল কপালে। আঁচল দিয়ে ঘাম মুছল রোজী। উথলে উঠেছে দুধ। কড়াইটা চুলা থেকে নামাতে নামাতে হঠাৎই সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলল ও। যা থাকে কপালে। আর পিল খাবে না সে।

সাত

জানুয়ারি মাসের এক সন্ধ্যা।

সীমান্ত ডি সুজাদের বাসায় গেছে আড্ডা দিতে। মি. রবার্টের সাথে বেশ জমে উঠেছে ওর, বোঝাই যায়। হাতে কাজ না থাকলে বৃদ্ধের সাথে গল্প-গুজব করে। রোজী অবশ্য ওই দিনের পরে আর ও বাসায় যায়নি। ইদানীং একা থাকতেই বেশি ভাল লাগছে ওর।

সেদিন সন্ধ্যায় বিছানায় শুয়ে লেটেস্ট 'সানন্দা'র পাতা ওল্টাচ্ছিল রোজমেরী, এমন সময় বেজে উঠল কলিংবেল। দরজা খুলে দেখল মিসেস ডি সুজা, সঙ্গে বেঁটেখাট, কালো মত এক ভদ্রমহিলা। পরনে তাঁতের শাড়ি। ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন পঞ্চাশোর্ধ্ব মহিলা।

'অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম না তো?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ডি সুজা। 'ইনি রানু অধিকারী। ছ'তলায় থাকেন। রানু এ হলো ফ্লোরা রোজমেরী। সীমান্ত হাসানের স্ত্রী।'

'কেমন আছেন, রোজমেরী?' আন্তরিক গলায় জানতে চাইলেন রানু। 'ড্রিম-হাউজে সু-স্বাগতম!'

'সীমান্তর সাথে রানুর পরিচয় হয়েছে আমাদের বাসায়,' ব্যাখ্যা করলেন ডি সুজা। 'ওর খুব ইচ্ছে তোমার সঙ্গে কথা বলার। তাই নিয়ে এলাম। তা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কথা বলবে নাকি ভেতরে ঢুকতে-টুকতে দেবে?'

লজ্জা পেল রোজী। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন, আসুন। ভেতরে আসুন।'

'কি করছিলে?' ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে প্রশ্ন করলেন মিসেস ডি সুজা।

'এই পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিলাম আর কি! বসুন, প্লীজ!' সোফা দেখাল রোজমেরী।

'কুশনগুলো নতুন কিনেছ?' বসতে বসতে বললেন মিনি।

'জ্বী। গতকাল বিকেলে আড়ং থেকে এনেছি।'

'কত নিল?' জানতে চাইলেন নতুন অতিথি।

'তিন হাজার।'

'ওরা আসলে গলা কাটা দাম নেয়!' মন্তব্য করলেন রানু অধিকারী।

'তবে জিনিসও দেয় ভাল।'

'তা অবশ্য ঠিক।' সায় দিলেন ভদ্র মহিলা।

'রোজমেরী এখানে এসে ফ্ল্যাটটার চেহারাই বদলে দিয়েছে,' বললেন মিসেস ডি সুজা। 'ভাল কথা। এ জিনিসটা রাখো। আমার এবং রবার্টের তরফ থেকে।' গোলাপী টিস্যুতে মোড়ানো ছোট একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলেন তিনি রোজীর দিকে। রোজী হাতে নিয়ে টিপে দেখল শক্ত কিছু আছে প্যাকেটের ভেতরে।

'আমার জন্য?' বলল সে। 'কিন্তু কেন?'

'সামান্য একটা উপহার,' বললেন মিসেস ডি সুজা। 'বিপদে-

আপদে সাহায্য করবে। আহা, খুলেই দেখো না একবার!'

রোজী টিস্যু পেপারের বাক্সটা খুলল। অবাক হয়ে দেখল ভেতরে শীলার সেই রূপোর চেন সহ বলের মত কবচটা। গা গোলানো গন্ধটা নাকে ধাক্কা দিতেই দম বন্ধ হয়ে এল ওর।

'জিনিসটা অত্যন্ত পুরানো,' বললেন মিসেস ডি সুজা। 'প্রায় তিনশো বছরের পুরানো।'

'জিনিসটা সুন্দর,' বলল রোজী, বলটা দেখতে দেখতে একবার ভাবল বলে দেবে নাকি শীলা এই জিনিস তাকে আগেই দেখিয়েছে।

'বলের ভেতরে সবুজ ভেষজ আছে। ওটাকে ইংরেজীতে বলে ট্যানিস রুট। কবিরাজী নাম নিদ্রিক্ষারিষ্ট,' ব্যাখ্যা করলেন তিনি। 'পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের কিছু দুর্লভ লতাপাতা আছে ওতে।'

'নিদ্রিক্ষারিষ্ট!' অবাক হলো রোজী। 'এমন অদ্ভুত নাম জীবনে শুনিনি।'

'নানা গাছের পাতা এবং ফল ভরা আছে বলে। বলতে পারো এটা একটা বিপত্তারিণী কবচ। সেই সাথে সৌভাগ্যও বয়ে আনে। নাও, কবচটা গলায় পরে ফেলো।'

'কিন্তু...'

'ভয় নেই। খারাপ কিছু দিইনি তোমাকে। গন্ধটার কথা ভাবছ? ওটা কয়েকদিন পরে সয়ে যাবে।'

বৃদ্ধাকে কষ্ট দিতে মন চাইল না রোজীর, চেনটা গলায় পরল, ছোট্ট বলটা ওর দুই বুকের ভাঁজে গিয়ে ঠেকল। ঠাণ্ডা। শিরশির করে উঠল গা। ওরা যাওয়া মাত্র এ জিনিস আমি খুলে ফেলব, মনে মনে ভাবল সে।

রানু অধিকারী এতক্ষণে কথা বললেন, 'চেনটা আমাদের এক বন্ধু নিজের হাতে বানিয়েছে। রিটায়ার্ড ডেন্টিস্ট। অবসরে সোনা-রুপো দিয়ে নানা জুয়েলারী তৈরি করা তার হবি। মিনিদের

বাড়িতে ওর সাথে শীঘ্রি হয়তো আপনার পরিচয় হবে। খুব মিশুক আমাদের বন্ধুটি। অবশ্য সবার সাথে একদিন আপনার পরিচয় হয়ে যাবে।'

'ওকে "তুমি" করেই বোলো, রানু,' বললেন মিসেস ডি সুজা। 'রোজী আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে। কিছু মনে করবে না।'

'জ্বী, জ্বী। তুমি করেই বলবেন,' দ্রুত বলে উঠল রোজী। 'আমি তো আসলে আপনাদের মেয়ের মতই।'

এরপর নানা প্রসঙ্গ নিয়ে গল্প জমে উঠল। কথা বললেন মূলত মিসেস ডি সুজা, শ্রোতার ভূমিকা পালন করল রোজী এবং রানু অধিকারী। ভদ্র মহিলা তাঁর ছোটবেলার গল্প শোনালেন। বললেন তাঁর বাবা ছিলেন মস্ত কবিরাজ। মিসেস ডি সুজা নিজেও কবিরাজীর অনেক টোটকা চিকিৎসা জানেন। নিদ্রিক্ষারিষ্টের বিশেষ কিছু লতাপাতা নিজেই সংগ্রহ করেছেন। নানা ওষুধ তৈরির জন্য যেসব উপাদানের প্রয়োজন হয় সে সবও নাকি তাঁর সংগ্রহে আছে। পেছনের বারান্দায় তিনি রীতিমত একটা বাগান করে ফেলেছেন যেখানে কবিরাজীর বিভিন্ন চিকিৎসার জন্য হেন গাছ নেই যা নেই।

'আপনি তো আমাকে আপনার বাগান দেখালেন না!' অভিযোগ করল রোজী।

'কি করে দেখাব? তুমি সেই যে গেলে আর তো এলে না।'

'আসব। আসলে ক'দিন ধরে শরীরটা ভাল ঠেকছে না।'

'কোন সমস্যা হয়নি তো?' উদ্বিগ্ন গলায় শুধোলেন মিনি।

'না, মানে। শারীরিক দুর্বলতার সাথে একটু বমি বমি লাগছে।'

'কি ব্যাপার?' কৌতুক ঝিলিক দিল মিসেস ডি সুজার চোখে। 'অন্য কোন খবর নয়তো?'

'যান! জানি না!' লজ্জায় ফর্সা গাল লালচে হয়ে উঠল রোজীর।

পরদিন সকালে ম্যাজ ম্যাজ শরীর নিয়ে ঘুম ভাঙল ফ্লোরা রোজমেরীর। বোটকা একটা গন্ধে ঘর ভরে আছে। নিদ্রিক্ষা... নামটা পুরো মনে করতে পারল না ও। মনে মনে বলল, নিকুচি করি নিদ্রিক্ষার' ওটাকে ঠিক ফেলে দেব আমি।

রাতে কবচটা খুলে বেড সাইড টেবিলের ওপর রেখেছিল রোজী। সারা রাত মনের সুখে বিশ্রী গন্ধ ছড়িয়েছে ওটা। টেবিলের ওপর একটা রাইটিং প্যাড ছিল। একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ওটাকে দিয়ে বলটাকে মোড়াল সে। ওয়ার্ডরোবের নিচের ড্রয়ারে তালা মেরে রাখল। এখনই কবচটা ফেলে দেয়া ঠিক হবে না। মিসেস ডি সুজা জানতে পারলে খুবই কষ্ট পাবেন। বেশি বকবক করলেও ভদ্র মহিলাকে ভালই লাগে ওর।

আড়মোড়া ভেঙে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল রোজী। পর্দা টেনে দিতেই সোনালি রোদ ছুঁয়ে গেল ওর শরীর। সামরিক যাদুঘরের সবুজ মাঠটা যেন কার্পেট বিছানো। চোখ জুড়িয়ে যায়। তবে সংসদ ভবনের 'ভিউ' এখান থেকে দৃশ্যমান নয়। শুধু পুরানো এয়ারপোর্ট দেখা যায়। বিজয় সরণী এই সকাল বেলাতেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। রোজীকেও এখনই ব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে। নাস্তা তৈরি, সীমান্তর জন্য গোসলের পানি গরম, (সে সারা বছর সকাল বেলায় হালকা গরম পানিতে গোসল করে) রাতের উচ্ছিষ্ট বাসন-কোসনগুলোও ধুতে হবে।

টেলিফোনের ক্রিং-ক্রিং শব্দে ঘুরে দাঁড়াল রোজমেরী। ওর ফোন নয়, সীমান্তর। গলা চড়িয়ে ডাকল, রোজী, 'সীমান্ত। তোমার ফোন!'

বাথরুমে ঢুকে শেভ করছিল সীমান্ত হাসান, জানতে চাইল, 'কে?'

'রফিকুল ইসলাম সাহেব।' রফিকুল ইসলাম সীমান্তর নাটকের

দলের লোক। রোজীর সাথেও পরিচয় আছে।

অর্ধেক গাল মসৃণ ভাবে কামানো, বাকি গাল ফেনা বোঝাই, অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথের দরজা খুলে ঘরে ঢুকল সীমান্ত, হাতে ব্রাশ। ওর কপালে ভাঁজ, চেহারায় কেমন একটা অস্থির ভাব। জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার?'

ওর দিকে সরু চোখে তাকাল রোজী, ঠোঁট ওল্টাল, 'আমি কি জানি। আমাকে বলেনি।'

রিসিভার কানে লাগাল সীমান্ত হাসান। 'হ্যালো?'

রোজী দেখল অপর পক্ষের কথা শুনতে শুনতে চোখের কোনা কুঁচকে উঠল সীমান্তর। হঠাৎ 'ইয়াল্লা!' বলে আর্তনাদ করে উঠল।

রোজী কাছে চলে এল। ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'কি হয়েছে?'

ওর দিকে না তাকিয়ে সীমান্ত বলতে লাগল, 'রফিক সাহেব। এমন অবস্থা হবে আমি কল্পনাও করিনি। সত্যি, খুব খারাপ লাগছে...আসলে আমি এভাবে সুযোগটা চাইনি...না, ঠিক আছে...আপনি ওদের সাথে কথা বলতে পারেন...আমার কোন অসুবিধে নেই।'

ফোন রেখে দিল সীমান্ত, চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। চেহারাটা ম্লান এবং বিবর্ণ।

'সীমান্ত?' ভয়ে ভয়ে ডাকল রোজী।

চোখ খুলল সীমান্ত। তাকাল স্ত্রীর দিকে।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'শোভন রহমান,' মৃদু গলায় বলল সীমান্ত। 'অন্ধ হয়ে গেছে। গতকাল সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না চোখে।'

'ওহ্‌, না!' গুঙিয়ে উঠল রোজী।

'সে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। ওকে ডাক্তাররা ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন।'

বিছানার ওপর আস্তে আস্তে বসল সীমান্ত। 'মিল্ক শিপ-এর বিজ্ঞাপনটা আমি পেয়ে গেছি। রফিকুল ইসলাম সে খবরটাই জানাল। কিন্তু এভাবে তো আমি কোন সুযোগ চাইনি!' ওকে দারুণ বিমর্ষ লাগল। 'আমাকে বম্বে যেতে হতে পারে শূটিং-এর জন্য। তবে কি জানো, আমি এ মুহূর্তে একটুও উৎসাহ পাচ্ছি না।'

'ভদ্রলোক হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেলেন?' বিড়বিড় করল রোজী। 'এটা চোখের কোন অসুখ নয়তো?'

'জানি না,' বলল সীমান্ত। 'রফিক তো বলল শোভন রহমানের সে রকম কোন সমস্যা ছিল না।'

'অদ্ভুত তো!' অবিশ্বাসে মাথা দোলাচ্ছে রোজী। 'একজন সুস্থ মানুষ হঠাৎ অন্ধ হয়ে যায় কি করে!'

আট

দুঃস্বপ্ন দেখছে রোজমেরী হাসান।

বিরাট একটা বলরুম। ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা খাট। খাটের ওপর শুয়ে আছে রোজী। শরীরে এক চিলতেও কাপড় নেই। ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো নগ্ন নারী-পুরুষ। এদের মধ্যে সীমান্তকেও দেখা যাচ্ছে। মহিলাদের মধ্যে পরিচিত আছেন শুধু মিসেস ডি সুজা এবং রানু অধিকারী। ওঁরাও নগ্ন। একা শুধু কাপড় পরে আছেন রবার্ট ডি সুজা। তাঁর মাথায় কালো টুপি, গায়ে

কালো সিল্ক রোব। তিনি একটা কালো, সরু লাঠি নিয়ে রোজীর মেদহীন শরীরে কি যেন আঁকতে শুরু করলেন। কর্কশ স্পর্শে শিউরে শিউরে উঠল রোজী। মাঝে মাঝে তিনি লাঠিটা একটা বাটিতে চোবাচ্ছেন। বাটির মধ্যে টকটকে লাল রঙের কি যেন। বাটিটা মস্ত, সাদা গোঁফওয়ালা এক লোক ধরে আছে। লাঠিটা পেট থেকে নেমে এল দুই ঊরুর মাঝখানে। রোজীকে ঘিরে থাকা লোকজন মৃদু স্বরে কথা বলছে, কোত্থেকে যেন ভেসে আসছে বাঁশির সুর। 'জেগে আছে ও,' রোজী শুনল সীমান্ত ফিসফিস করে বলছে মিসেস ডি সুজাকে। 'দেখতে পাচ্ছে সব কিছু।'

'আরে না!' ওকে অভয় দিলেন মিসেস ডি সুজা। 'ওকে যে জিনিস খাইয়েছি তাতে জেগে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। আর জেগে থাকলেও কিছু আসে যায় না। ও আজকের কথা কিছুই মনে করতে পারবে না। এসো, প্রার্থনা সঙ্গীত শুরু করা যাক।'

ওরা কি সব উদ্ভট মন্ত্র পড়ে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইতে শুরু করল। গানের একটি কথাও বুঝতে পারল না রোজী। তার দৃষ্টি চলে গেল জানালার দিকে। ওখানে একটা অয়েল পেইন্টিং ঝোলানো। চার্চের ছবি। চার্চে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। জানালার পাশে দাড়িওয়ালা এক লোক। হিম শীতল চোখে তাকিয়ে আছে রোজীর দিকে। রোজীর বুক শুকিয়ে গেল ভয়ে। সে মুখ হাঁ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দৃশ্যপট বদলে গেল।

রোজী দেখল খাটের সাথে ওর হাত পা বেঁধে ফেলা হয়েছে। সবাই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এমন সময় সীমান্ত উঠে এল খাটের ওপর। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে ওর। ঘরঘরে গলায় বলে উঠলেন রবার্ট, 'এইবার সীমান্ত!' ঠিক কামার্ত একটা পশুর মত সীমান্ত হাসান চড়াও হলো স্ত্রীর ওপর। রোজী চিৎকার করে উঠল, 'না!' বলে। ভয়ার্ত হয়ে দেখল, সীমান্ত নয়, আসলে

তার শরীরের ওপর উঠে এসেছে জানালার পাশের সেই বিশালদেহী দাড়িওয়ালা...

চোখ মেলে চাইল রোজী। সত্যি সত্যি তার শরীরের ওপর একটা লোক। আঁতকে উঠল সে দারুণভাবে। পরমুহূর্তে বুঝল ওটা তার স্বামী, সীমান্ত হাসান। জিরো ওয়ার্টের নীলচে আলোতে দেখা গেল এই শীতেও ঘামে ভিজে চকচক করছে ওর মুখ। রোজীকে তাকাতে দেখে আড়ষ্ট হাসল সে, চট করে নেমে পড়ল গায়ের ওপর থেকে। হাঁপাচ্ছে।

দারুণ অভিমান হলো রোজীর। এতই যদি শখ তাহলে ওকে জাগানো হলো না কেন? একটু আগে দেখা স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল। সীমান্তকে মনে হলো ধর্ষণকারী। এভাবে ঘুমের মাঝে কেউ চড়াও হয় নাকি? এদিকে দিনের বেলা সাহেবের কথা বলারও সুযোগ হয় না ব্যস্ততার অজুহাতে। অথচ রাতের বেলা যেভাবে হোক নিজের পাওনাটা আদায় করা চাই।

এই তো, আজ বিকেলে 'টাইটানিক'-এর দুটো টিকিট নিয়ে এসেছিল সীমান্ত। বিশ্বখ্যাত ছবিটি দেখার খুব ইচ্ছে ছিল রোজীর। কিন্তু টিকিট যেন সোনার হরিণ। সীমান্ত বলল, রফিকুল ইসলাম তাকে টিকিট দুটো ম্যানেজ করে দিয়েছে। রোজী খুব খুশিই হয়েছিল এক সাথে ইভনিং শোতে ছবি দেখতে যাবে বলে। কিন্তু সীমান্ত বলল সে যেতে পারবে না। কেন? তার নাকি কোথায় গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। সেখানে না গেলেই নয়। অভিমান করে রোজী বলেছিল সে যাবে না। কিন্তু সীমান্ত জোর করে ওকে মধুমিতায় পাঠাল। রোজী তার প্রিয় বান্ধবী সীমাকে নিয়ে শেষে ছবি দেখে এসেছে। অবশ্য 'টাইটানিক' দেখার পরে মন ভাল হয়ে গিয়েছিল ওর। সীমান্তর ওপর রাগও পুষে রাখেনি। বেচারার এখন উত্থানের সময়। কোথাও ওর জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে তা

সিনেমা দেখার চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল।

কিন্তু এখন সীমান্ত'র ওপর মেজাজটা বিগড়ে গেছে। সে একটা কাণ্ড ঘটিয়েছে। তার খেসারত দিতে হবে রোজীকে। এখন আবার বাথরুমে যাও, পরিষ্কার হয়ে আসো...

মুখ অন্ধকার করে বিছানায় উঠে বসল রোজী। সাথে সাথে চক্কর দিল মাথাটা। রাত দশটার দিকে মিসেস ডি সুজা কি এক চকোলেট এনে খেতে দিয়েছিলেন ওদেরকে। বলেছিলেন ঘরে বানানো। স্বাদ মন্দ নয়। কিন্তু খাওয়ার ঘন্টাখানেক পরে মাথাটা কেমন ভার ভার ঠেকতে লাগল, ঘুমও পেল খুব। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে রোজী নিজেও জানে না। এখন আবার ভার ভার অনুভূতিটা আবার ফিরে এসেছে।

সীমান্ত ডাক দিল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

জবাব দিল না রোজী, মশারী তুলে নামতে যাচ্ছে, খপ্ করে ওর হাতটা ধরে ফেলল সীমান্ত। বলল, 'সরি। আসলে মাথার ঠিক ছিল না। রবার্ট সাহেব ভদকা খাওয়ালেন। তারপর ঘুমের মধ্যে হঠাৎ...বিলিভ মি, সচেতন অবস্থায় কাজটা করিনি আমি।'

'থাক, আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না,' মুখ ঝামটা দিল রোজী। 'তোমার ইচ্ছে হয়েছে, করেছ। এখন ঘুমাও। আমাকে ছাড়ো। বাথরুমে যাব।'

ওর হাত ছেড়ে দিল সীমান্ত। ইতস্তত গলায় তারপরও ব্যাখ্যা দিল। 'না মানে। এরকম হয়, বুঝলে? ঘুমের মধ্যে কারও কারও সেক্সুয়াল আর্জ...'

কোন মন্তব্য করল না রোজী। দরজা খুলে অ্যাটাচড্ বাথে গিয়ে ঢুকল। সাথে সাথে নাক কুঁচকে উঠল ওর। বাথরুমে নিদ্রিক্ষারিষ্টের গন্ধ। এখানে পচা পাতার গন্ধটা এল কি করে? মনে পড়ল সীমান্তকে শার্ট ধুতে দেখেছে সে। হয়তো ওয়ার্ডরোবে কবচটার পাশে জামা রেখেছিল ও ভুলে। তাতেই গন্ধ হয়ে গেছে জামায়। তবে

ব্যাপারটাকে আমল দিল না রোজমেরী। দাঁড়াল শাওয়ারের নিচে। স্বপ্নটার কথা মনে পড়ছে বারবার। ঘিনঘিন করছে গা। যেন সত্যি ওকে ধর্ষণ করা হয়েছে। নাইটিটা খুলে ফেলল ও। তারপর শাওয়ার ছেড়ে দিল। কনকনে ঠাণ্ডা পানিতে ভিজতে লাগল চুপচাপ।

'সীমান্ত দিন দিন যেন দূরে সরে যাচ্ছে, অ্যাঙ্কেল,' অভিযোগের সুরে বলল রোজী তার ডেভিড কাকাকে। ব্রিটিশ কাউন্সিলে বই ফেরত দিতে এসেছিল সে। দেখা হয়ে গেল আলবার্ট ডেভিডের সাথে। তিনি প্রেত চর্চার ওপরে একটা বই লিখছেন। রেফারেন্স খুঁজতে এসেছিলেন ব্রিটিশ কাউন্সিলে। রোজীকে দেখে খুব খুশি হলেন। সীমান্তর কথা জানতে চাইলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বসল রোজী।

'ওর ব্যস্ততা যত বাড়ছে ততই যেন আমাদের মাঝে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হতে শুরু করেছে,' বলে চলল ও। 'সীমান্ত এখন বেশির ভাগ সময় শূটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বিকেলে বাসায় ফিরলে সন্ধেটা কাটায় সুজা সাহেবদের ঘরে।'

'সুজা সাহেবটা কে?' জানতে চাইলেন ডেভিড।

'আমাদের প্রতিবেশী। ভদ্রলোক অনেক দেশ ঘুরেছেন। সে সব গল্প বলেন আর সীমান্ত ছেলে মানুষের মত মুগ্ধ হয়ে তা শোনে। ওঁর সাথে নাকি অনেক ফিল্ম প্রডিউসারের পরিচয় আছে। সে টোপটা দিয়ে রেখেছেন সীমান্তর সামনে। সীমান্ত ফাতনা সুদ্ধ গিলে বসে আছে।'

'লোকটাকে তোমার কেমন মনে হয়? মানে ওই সুজা সাহেবকে।'

'পরিচয় হবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনাকে তিনি আপন করে নেবেন। তাঁর ওয়াইফও বেশ মাইডিয়ার লোক।'

'তা হলে তো ভালই। ভাল প্রতিবেশী পেয়েছ।'

'না, ভাল না। ওই ভদ্রলোক আমার স্বামীর মাথা খেয়েছেন। আমার দিকে সীমান্তর এখন আর নজর নেই।'

'আই সি! ভদ্রলোককে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। বেশ ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার মনে হচ্ছে।'

'ওঁরা দু'জনেই। কথা বলতে শুরু করলে আর থামতে চান না। সুজা সাহেবের ওয়াইফ আমাকে কয়েকদিন আগে জোর করে একটা কবচ পরিয়ে দিলেন। এক নিদ্রিক্ষা না ফ্রিদিক্ষা নাম…'

'নিদ্রিক্ষারিষ্ট?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। আপনি জানলেন কি করে নামটা?' সাগ্রহে প্রশ্ন করল রোজী।

চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল আলবার্ট ডেভিডের।

'কবচটা তোমার কাছে আছে নাকি?'

'গলায় পরি না। ড্রয়ারে তালা মেরে রেখে দিয়েছি। মাগো, কি বিকট গন্ধ!'

'বাসায় গিয়ে আজকেই ওটা ফেলে দিয়ো, রোজী।'

'কেন, আঙ্কেল?'

'ও সব জিনিস কাছে না রাখাই ভাল। ও হ্যাঁ, একটা কথা—তোমাদের অ্যাপার্টমেন্টে একটা মেয়ে আত্মহত্যা করেছে ক'দিন আগে, না?'

'জ্বী।'

'ব্যাপারটা আমার ঠিক সুবিধের ঠেকছে না।'

'কেন?'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, রোজী, তোমাদের ও বাড়িটা ছেড়ে দেয়া উচিত।'

চেহারায় ভয় ফুটে উঠল ফ্লোরা রোজমেরীর। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আবার ভয় দেখাচ্ছেন কেন, আঙ্কেল?'

ওকে সান্ত্বনা দিলেন আলবার্ট। 'না, না। আমি থাকতে ভয়ের

কিছু নেই। আমি শীঘ্রি তোমাদের বাসায় একবার যাব।'

'সে তো আপনি আগেও একবার বলেছেন,' অভিমানে ঠোঁট ফোলাল রোজী। 'আর তো আসলেনই না।'

'না, এবার সত্যি যাব। দেখে আসব কেমন সংসার সাজিয়েছ। তাছাড়া বিশেষ একটা প্রয়োজনে এবার "ড্রিম হাউজ"-এ যেতেই হবে। আর শোনো, ও সব কবচ-টবচ গলায় দিয়ো না। স্মার্ট মেয়েদের কবচে একদম মানায় না!'

জানুয়ারি মাসের ১০ তারিখ, শুক্রবার দুপুরে একটা ঘটনা ঘটল।

সাড়ে বারোটার দিকে সনি টিভিতে সীমান্ত হাসান 'স্টার ইয়ার কালাকার' দেখছিল। রোজী ব্যস্ত ছিল রান্নাঘরে। পটল ভাজছিল। সীমান্ত ডাক দিল, 'রোজ, আমাকে এক গ্লাস জুস দিয়ে যাও তো।'

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ডাইনিংরুমে চলে এল রোজী। ফ্রিজ খুলল, জুসের ক্যান বের করবে। হঠাৎ মাথাটা ভীষণভাবে ঘুরে উঠল ওর, নিমিষে আঁধার ঠেকল সব কিছু, হাত থেকে ক্যানটা পড়ে গেল মেঝেতে, বিকট শব্দ হলো ঠনঠন করে। একই সাথে ফ্রিজের পাশে চিৎ হয়ে পড়ে গেল রোজী, আর নড়ল না।

শব্দ শুনে 'কি হলো! কি হলো!' বলে দৌড়ে এসেছিল সীমান্ত। রোজীকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে আঁতকে উঠল ভীষণভাবে। দৌড়ে গিয়ে স্ত্রীর মাথাটা কোলে তুলে নিল। ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগল, 'রোজ! রোজ!' বলে। কিন্তু চোখ বুজে পড়েই রইল ফ্লোরা রোজমেরী।

নয়

ধীরে ধীরে চোখ মেলল রোজী। দেখল পরিচিত কয়েকটা মুখ ওর দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওকে চোখ মেলতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সীমান্ত। বলল, 'কি হয়েছিল, রোজ? হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলে কিভাবে?'

দুর্বল হাসল রোজী। 'জানি না ঠিক। মাথাটা হঠাৎ এমনভাবে ঘুরে উঠল...'

স্টেথেস্কোপ গলায় এক ভদ্রলোক, নাম জানে না রোজী, তবে মোড়ের ডিসপেন্সারীতে সন্ধ্যার পরে মাঝে মাঝে বসতে দেখেছে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এরকম কি প্রায়ই মাথা ধরে আপনার?'

'না। গত কয়েকদিন ধরে এমন হচ্ছে। সেই সাথে বমি ভাব। পরশুদিন বমিও করলাম।'

মিসেস ডি সুজা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করলেন তিনি ডাক্তারের সাথে। বললেন, 'তোমার শরীর খারাপের কথা আমাদের বলোনি তো কখনও! ভাগ্যিস আজ সীমান্ত বাসায় ছিল। নইলে কি যে হত!'

'আমি আর কি করলাম?' ক্ষীণ প্রতিবাদ করল সীমান্ত। 'আপনারাই তো ডাক্তার ডেকে আনলেন। আচ্ছা, জহির সাহেব, ভয়ের কিছু নেই তো?'

'না, না। সেরকম কিছু হয়নি আপনার স্ত্রীর। একটা ট্যাবলেট

লিখে দিচ্ছি। ওটা দু'বেলা খাওয়ার পরে খাইয়ে দেবেন। মাথাব্যথা এবং বমি ভাব দুটোই চলে যাবে।...আর একটা কথা জানতে চাইছি—ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না, আপনার পিরিয়ডে কোন গোলমাল নেই তো?'

লালচে হয়ে উঠল রোজীর চেহারা। মৃদু গলায় বলল, 'এ মাস থেকে হচ্ছে না।'

মুচকি হাসলেন ডাক্তার। সীমান্তর দিকে ফিরে বললেন, 'আমার মনে হয় আপনার স্ত্রীকে একজন গাইনোকলোজিস্ট দিয়ে দেখানো দরকার। আমার অনুমান সত্যি নাও হতে পারে, মেয়েদের পিরিয়ড মাঝে মাঝে নানা জটিলতার কারণে দু'একমাস বন্ধ হয়েও থাকে। তবু, আমার ধারণা, আপনার স্ত্রীর একটা প্রেগন্যান্সী টেস্ট প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।'

বারো জানুয়ারি বিকেল পাঁচটায় রোজমেরী ফোন করল ডা. শায়লা বেগমের কাছে। ফোন ধরলেন ডাক্তার স্বয়ং।

'আপা, আমি রোজমেরী হাসান।'

'কংগ্রাচুলেশন্স, মিসেস হাসান। আপনার প্রেগন্যান্সী রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। নাউ ইউ আর গোয়িং টু বি আ প্রাউড মাদার।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

বিছানার এক কোণে ধীরে ধীরে বসে পড়ল রোজী, হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ। কানে বারবার বাজছে শব্দটা—সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি সত্যি।

'ডেট কবে?' লাজুক স্বরে প্রশ্নটা করল ও।

'আপনার লাস্ট পিরিয়ড যদি ডিসেম্বরের দশ তারিখ হয়ে থাকে,' বললেন শায়লা বেগম. 'সে হিসেবে আপনার ডেলিভারি

ডেট গিয়ে পড়ছে অক্টোবরের দশ তারিখে।'

'ধন্যবাদ, আপা।'

'ও হ্যাঁ, শুনুন। আগামী মাসের বিশ/ একুশ তারিখের দিকে একবার আমার চেম্বারে আসবেন। এখন থেকে রেগুলার চেক-আপের প্রয়োজন পড়বে আপনার।'

'আসব আপা। আবারও ধন্যবাদ। রাখি।'

ফোন রেখে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রোজী। সবুজ মাঠে ঝলমল করছে বিকেলের রোদ। সামরিক জাদুঘরের মাঠে বেশ কয়েকটা ছোট ট্যাঙ্ক। একটা ট্যাঙ্কের ওপর একজোড়া সাদা কবুতর জগৎ-সংসার ভুলে সোহাগ করছিল পরস্পরকে। সেদিকে দৃষ্টি ছুঁয়ে বিজয় সরণীর রাস্তায় চলে গেল ওর চোখ। ব্যস্ত রাজপথ। ফুটপাথ ধরে এক তরুণী হেঁটে আসছে, মুঠিতে চেপে আছে বছর তিনেকের ছোট্ট একটি মেয়ের হাত। বাচ্চাটির এই বন্দী দশা সম্ভবত ভাল লাগছে না। এত দূর থেকেও রোজী দেখল গা মোড়ামুড়ি করছে বাচ্চা, তরুণীর মুখের দিকে চেয়ে প্রতিবাদের স্বরে কিছু বলল বোধহয়। তরুণী এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিল। বাচ্চা এবার রীতিমত পা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করে দিল। কিন্তু শক্ত হাতে তাকে চেপে ধরে থাকল তরুণী। আগ্রহ নিয়ে দৃশ্যটা দেখছিল রোজী। কেন যেন ওর চোখের কোনায় টলমল করে উঠল জল, মা হব আমি, ভাবছে ও, অমন ফুটফুটে একটি বাচ্চার আমিও মা হব।

•

খরবটা শুনে সীমান্ত হাসানের প্রতিক্রিয়া হলো দেখার মত। সে নেচে-কুঁদে অস্থির হলো। চুমুতে ভরিয়ে দিল স্ত্রীকে। 'বাবা হব! আমি বাবা হব!' বলে ছেলে মানুষের মত লাফাতে লাগল। ওকে থামাতে বেগ পেতে হলো রোজীর। শেষে শান্ত হয়ে সীমান্ত প্রশ্ন করল, 'মিনি আন্টি আর রবার্ট আঙ্কেলকে সুখবরটা দিয়েছ?'

'না। এখনও জানাইনি।'

'ওঁদেরকে বলে দিয়ো। ওঁরা তোমাকে খুব ভালবাসেন। দেখবে কত খুশি হবেন।'

'বলব।'

'থাক্। আমিই যাই। তুমি থাকো।' রোজীকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সীমান্ত।

মনটাই খারাপ হয়ে গেল রোজীর। আনন্দের খবরটা সে এই মুহূর্তে শুধু স্বামীর সঙ্গে ভাগ করতে চেয়েছে, অন্য কারও সাথে নয়। প্রতিবেশীদেরকে পরে জানালেও চলত। কিন্তু সীমান্তটা যে কি!

কিছুক্ষণ পরে সীমান্ত হাজির হয়ে গেল তার আঙ্কেল এবং আন্টিকে নিয়ে। মিসেস ডি সুজা রোজীকে জড়িয়ে ধরলেন। 'কংগ্রাচুলেশন্স, রোজী।'

'তোমার জন্য আমাদের অনেক অনেক আশীর্বাদ থাকল,' মি. ডি সুজা আলতো করে রোজমেরীর কপালে হাত ছোঁয়ালেন। 'সরি, ঘরে শ্যাম্পেন নেই। তাহলে সেলিব্রেট করা যেত।'

'না, না; ঠিক আছে,' হাসিমুখে বলল রোজী।

'তোমার ডেট কবে, সোনা?' ওকে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে জানতে চাইলেন মিসেস ডি সুজা।

'অক্টোবরের দশ তারিখে।'

'বেশ, বেশ। তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। এখন থেকে তোমার সব ভাবনা আমাদের।'

'আমরা জানি সে কথা,' বলল সীমান্ত। 'একটু আগে রোজকে সেটাই বলছিলাম আপনারা থাকতে ওর কোন চিন্তা নেই।'

'অবশ্যই।' বললেন মি. রবার্ট। 'তা, মা, ভাল ডাক্তার দেখাচ্ছ তো?'

'জ্বী। ঢাকা মেডিকেলের গাইনো বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা ডা. শায়লা বেগমকে দেখাচ্ছি।'

'শায়লা বেগম?' ভুরু কোঁচকালেন রবার্ট। 'নাম শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।'

'ওঁর চেম্বারটা সেগুনবাগিচায়। নাম সেবা।'

'ওহ্, এবার মনে পড়েছে! কিন্তু, মা, আমরা তো ঠিক করেছিলাম তোমাকে মোস্তাফিজ সাহেবকে দেখাব।'

'মোস্তাফিজ সাহেব?'

'পি.জি-র রিটায়ার্ড প্রফেসর ডা. মোস্তাফিজুর রহমান। নাম শোনোনি? শুধু ঢাকা নয়, সম্ভবত বাংলাদেশের সেরা গাইনোকলোজিস্ট। আমাদের খুব ভাল বন্ধু। তোমাকে খুব ভাল করে দেখবেন। ভিজিটও নেবেন কম।'

'গণ কণ্ঠের স্বাস্থ্য পাতায় যিনি নিয়মিত লেখেন সেই ভদ্রলোক কি?' জিজ্ঞেস করল রোজমেরী।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তিনিই। সাংঘাতিক ব্যস্ত ডাক্তার। প্রচুর রোগী তাঁর।'

'আমিও ওঁর কথা খুব শুনেছি,' সায় দিল সীমান্ত। 'ডেলিভারিতে নাকি তাঁর তুলনা মেলা ভার। রোজ, মোস্তাফিজ সাহেবকেই আসলে তোমার দেখানো উচিত ছিল।'

'তাহলে শায়লা বেগমের ব্যাপারে কি করব?' প্রশ্ন করল রোজী।

'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।' বলল সীমান্ত। 'আমি ম্যানেজ করে নেব।'

মিসেস ডি সুজা বললেন, 'মোস্তাফিজ সাহেবের মত ডাক্তার থাকতে আমি জেনে শুনে শায়লা বেগমের মত অপরিচিত ডাক্তারের হাতে তোমাকে তুলে দিতে পারি না।'

'কিন্তু শায়লা বেগম সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনিনি তো আমি!'

ক্ষীণ প্রতিবাদ করল রোজী। ভদ্র মহিলার ব্যবহার ওকে মুগ্ধ করেছে। তাই হুট করে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চায় না। 'উনি বলেছেন ডেলিভারির সময় মেডিকেলে আমার কেবিনের ব্যবস্থা করে দেবেন।'

'ঢাকা মেডিকেলের কেবিন!' তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল রবার্ট ডি সুজার গলায়। 'ওর চেয়ে মুরগীর খোঁয়াড়ও ভাল। গাইনী ওয়ার্ড সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না, রোজমেরী। ওর সামনে দিয়ে গেলেও মনে হবে নরক ঘুরে এসেছ।'

'কেবিনের জন্য ভেব না তুমি।' বললেন মিসেস সুজা। 'মোস্তাফিজ সাহেবের নিজস্ব ক্লিনিক আছে। তুমি চাইলে পি.জি.তেও কেবিনের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।'

রোজী হাসল তাঁর দিকে চেয়ে। 'আপনারা এত করে যখন বলছেন আমি একবার যেতে পারি তাঁর কাছে। কিন্তু মোস্তাফিজ সাহেবের যে ব্যস্ততার কথা শুনলাম উনি হয়তো আমাকে সময়ই দিতে পারবেন না।'

'ব্যস্ত তো অবশ্যই,' বললেন মিসেস ডি সুজা। 'তবে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের জন্য তিনি ঠিকই সময় বের করে নেন। তোমাদের ফোনটা কোন ঘরে? ওঁর বাসায় একটা ফোন করব।'

'আমাদের বেডরুমে,' বলল সীমান্ত।

মিসেস ডি সুজা গটগট করে এগোলেন বেডরুমের দিকে, মি. ডি সুজা মিষ্টি করে হাসলেন রোজীর দিকে, 'মোস্তাফিজ সাহেব শুধু ডাক্তার হিসেবেই ব্রিলিয়ান্ট নন, মানুষ হিসেবেও খুব ভাল এবং আন্তরিক। এখন দেখি, মিনি কি খবর নিয়ে আসে।'

মিসেস ডি সুজার এমনিতেই চেঁচিয়ে কথা বলার অভ্যাস, এবার রোজীকে শোনাবার জন্যই যেন ইচ্ছে করে আরও গলা চড়ালেন। 'হ্যালো, মোস্তাফিজ সাহেব? আমি মিনি। হ্যাঁ, ভাল আছি। শুনুন। আমাদের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আজকেই জানতে পারল সে প্রেগন্যান্ট

হয়ে পড়েছে। আমি আপনার কথা ওকে বলেছি। আপনি কবে সময় দিতে পারবেন, বলুন? ও যাবে আপনার কাছে।' অল্পক্ষণ নীরবতা। তারপর বললেন, 'এক মিনিট।' গলা বাড়িয়ে ডাকলেন, 'রোজমেরী, বুধবার ছ'টার সময় যেতে পারবে তুমি মগবাজারে, মোস্তাফিজ সাহেবের চেম্বারে?'

'পারব,' চেঁচিয়ে জবাব দিল রোজী।

'ঠিক আছে, মোস্তাফিজ সাহেব,' আবার কানে রিসিভার ঠেকালেন মিসেস ডি সুজা। 'রোজমেরী, বুধবার ছ'টার মধ্যে পৌঁছে যাবে আপনার চেম্বারে। থ্যাংক ইউ। গুড নাইট।'

হাসিমুখে ঢুকলেন তিনি লিভিংরুমে। 'দেখলে তো কোন সমস্যা হলো না। এখন ঠিকানাটা লিখে নাও। মোস্তাফিজ সাহেবের চেম্বার হলো অয়্যারলেস অফিসের পেছনে, ২৩৯, মগবাজার…'

দশ

ফ্লোরা রোজমেরী তার দৈনন্দিন কাজগুলো আগের মতই করে যেতে লাগল। বাজার হাট করা, রান্না, কাপড় ইস্ত্রি, ঘর গোছানো সব চলতে লাগল আগের মতই। তবে সমস্ত কাজের মাঝেও তার মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকল অদিতি বা আদিত্য (অথবা ধ্রুব) আস্তে আস্তে ওর পেটের ভেতর বড় হয়ে উঠছে সেই চিন্তায়।

ডা. মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে নির্ধারিত দিনেই দেখা করেছে রোজী। ভদ্রলোক লম্বা, দুধের মত ঘন, সাদা চুল, ঠোঁটে মস্ত মিলিটারি গোঁফ, চোখজোড়া ঝকঝকে, বুদ্ধিদীপ্ত। ডাক্তার নয়,

প্রথম দেখায় তাঁকে অবসরপ্রাপ্ত একজন জেনারেল মনে হয়েছে রোজীর। তাঁর চেম্বারটি বেশ বড় সাজানো-গোছানো।

রোজীকে প্রথমেই তিনি বললেন, ' "কিভাবে মা হবেন" বা "প্রসূতি মায়ের কর্তব্য" ধরনের বইটই এই সময় একদম পড়বেন না। কারণ প্রতিটি মহিলার প্রেগন্যান্সির ধরণ আলাদা, আর ওসব বইতে যে ধরনের তথ্য থাকে তা আপনার ঘুম হারাম করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। কারণ বইতে প্রেগন্যান্সি বিষয়ক যে সব লেখা থাকে বাস্তব তা থেকে অনেক ভিন্ন। আর বন্ধু-বান্ধবরা এ ব্যাপারে অনেকেই পরামর্শ দিতে চাইবে। তাদের কথায় কান দিলে খামোকা দুশ্চিন্তা করে মরবেন। কারণ তারা প্রথমেই যে জিনিসটা বোঝাতে চাইবে তা হলো তাদের প্রেগন্যান্সি ছিল নর্মাল আর আপনারটা অ্যাবনর্মাল।'

শায়লা বেগম ওকে ভিটামিন পিল খেতে বলেছিলেন, ডাক্তারকে সে কথা জানিয়ে দিল রোজী।

'না, পিল-টিল চলবে না,' সাফ বলে দিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। 'মিসেস ডি সুজার' কাছে কবিরাজী অনেক লতাপাতা আছে, ব্লেন্ডারও আছে। আমি তাঁকে একটা ড্রিংক তৈরির উপায় বাতলে দেব। ওটার মত নিরাপদ , তাজা এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ জিনিস আপনি বাজারে চালু কোন বড়ির মধ্যে পাবেন না। আরেকটা কথা—যখন যা খেতে মন চাইবে, খাবেন। এ সময় অনেক মেয়ের খিদে বেড়ে যায়। মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব জিনিস খেতেও ইচ্ছে করতে পারে। খেতে দ্বিধা করবেন না। আর যদি কোন ব্যাপারে কোন প্রশ্ন জাগে মনে, সোজা এখানে চলে আসবেন বা ফোন করবেন। মনে রাখবেন, সঠিক পরামর্শ দেয়ার জন্য আমি আছি। নানী বা দাদীদের ওপর ভরসা করতে যাবেন না।'

মাস খানেক পরে আবার ডাক্তারের কাছে যেতে হলো রোজীকে। সে লবণ দেয়া কোন খাবার খেতে পারছে না। গা

গুলিয়ে আসে।

'এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়,' সব শুনে মন্তব্য করলেন মোস্তাফিজুর রহমান। 'একটা সময় আবার দেখবেন লবণ ছাড়া কোন খাবার খেতে পারছেন না। ভাল কথা, মিসেস ডি সুজার মিকশ্চারটা নিয়মিত খাচ্ছেন তো?'

'জ্বী,' মাথা দোলাল রোজী।

মিসেস ডি সুজা প্রতিদিন সকাল এগারোটায় একটা মিকশ্চার নিয়ে আসেন রোজমেরীর জন্য। জিনিসটা ঘন, হলদে রঙের, ঠাণ্ডা, কেমন টকটক স্বাদ।

'কি এটা?' প্রথম দিন জানতে চেয়েছিল রোজী।

'শামুক, গুগলি আর তেলাপোকার ঝোল,' বললেন মিসেস ডি সুজা, হাসছেন।

হাসল রোজীও। 'ভাল জিনিসই এনেছেন। এটা খেলে মেয়ের মা হতে পারব?'

'মেয়ে চাইছ নাকি?'

'জ্বী। নামও ঠিক করে রেখেছি। অদিতি।'

'বেশ নাম তো! আর ছেলে হলে?'

'আদিত্য। ছেলে হলেও আপত্তি নেই। তবে ফার্স্ট প্রেফারেন্স মেয়ে।'

'তাহলে এটা চোখ বুজে ঢকঢক করে গিলে ফেলো। মনে মনে যা চাইবে, পাবে।'

'সত্যি?' গ্লাসটা হাতে নিল রোজী। 'আসলে বলুন তো এটা কি?'

'কাঁচা ডিম, ছাগলের দুধ, কুমড়োর কচি ডগা, বাসকের শিকড়ের রস সহ আরও কিছু লতাপাতার নির্যাস।'

'আপনার সেই নিদ্রিক্ষারিষ্টের মত?'

'অনেকটা তাই।'

'ডাক্তার সাহেবের প্রেসক্রিপশন, না?'

'হ্যাঁ। তিনি এলোপ্যাথিক হলেও কিছু কিছু ব্যাপারে কবিরাজী চিকিৎসার সাহায্য নেন। তাতে আশ্চর্য ফলও পাওয়া যায়। নাও, আর কথা বলো না। চট্ করে খেয়ে নাও।'

ঠাণ্ডা, হলদে রঙের কফের মত জিনিসটা খেতে প্রথম প্রথম গা ঘিনঘিন করেছে রোজীর। কিন্তু কয়েকদিন খাওয়ার পরে গা গোলানো ভাবটা চলে গেছে। ঠিক এগারোটার সময় মিসেস ডি সুজা নীল আর সবুজ স্ট্রাইপ দেয়া বড় একটা গ্লাসে মিকশ্চারটা নিয়ে আসেন, রোজীর খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকেন পাশে।

দিন কয়েক পরে রোজীর পেটে হঠাৎ খুব ব্যথা উঠল। যেন ভেতর থেকে ছুরি দিয়ে খোঁচাচ্ছে কেউ। মোস্তাফিজুর রহমানকে ফোন করে খবরটা দিল সে। ডাক্তার ওকে সন্ধেবেলা দেখা করতে বললেন। পেটে ব্যথা নিয়েও একাই রোজীকে তাঁর চেম্বারে যেতে হলো। কারণ সীমান্ত বম্বে গেছে সেই কনডেন্সড মিল্কের বিজ্ঞাপন করতে। মিসেস ডি সুজাকে ইচ্ছে করলে বলতে পারত রোজী। কিন্তু ভদ্রমহিলা ওর জন্য এমনিতেই অনেক কিছু করছেন। এখন আবার সামান্য এ ব্যাপারটা নিয়ে বিরক্ত করতে মন চাইল না। রোজী রিকশা দিয়ে চলে এল ডাক্তারের চেম্বারে। ওকে পরীক্ষা করে মোস্তাফিজুর রহমান বললেন, ভয়ের কিছু নেই। পেলভিস থেকে ব্যথাটা উঠেছে। দু'তিনদিন পরে এমনিই চলে যাবে। রোজীকে সাধারণ ডোজের অ্যাসপিরিন খেতে বললেন ডাক্তার।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল রোজী। 'খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ইকটোপিক প্রেগন্যান্সির লক্ষণ।'

'ইকটোপিক?' প্রশ্ন করলেন মোস্তাফিজুর রহমান, সন্দেহের

দৃষ্টিতে তাকালেন ওর দিকে। রোজীর চেহারায় রঙ ধরল। 'এই শব্দটা কোথায় পেলেন, মিসেস হাসান?'

'সেদিন সানন্দা পত্রিকায় পড়লাম...' নখ দিয়ে টেবিল খুঁটছে রোজী।

'আপনাকে আমি এ জন্যই বই বা পত্রিকা পড়তে বারণ করেছিলাম। সানন্দা পড়ে খামোকা দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন, দেখলেন তো? আর ওসব পড়বেন না। ঠিক আছে?'

'জ্বী,' বাধ্য মেয়ের মত মাথা দোলাল রোজী।

'ব্যথাটা দু'তিনদিনের মধ্যে চলে যাবে। ভাববেন না।'

কিন্তু দু'তিনদিনের মধ্যে ব্যথাটা চলে গেল না, বরং আরও তীব্র হয়ে উঠল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যথাটা ওকে অবশ করে রাখে। কয়েক মিনিটের জন্য চলে যায়। হঠাৎ আবার ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে। অ্যাসপিরিনেও তেমন কাজ হচ্ছে না। ভালমত ঘুমও হয় না রোজীর। ঘুমালে ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন দেখে।

তিনদিন পরে ডাক্তারকে ফোন করল রোজী আর সহ্য করতে না পেরে।

'ব্যথা থাকবে না। চলে যাবে,' ওকে আশ্বাস দিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। 'কারও কারও ক্ষেত্রে ব্যথাটা দীর্ঘস্থায়ী হয়। আপনার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে দেখছি। তবে ঘাবড়াবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মিসেস ডি সুজাও রোজীকে ঘাবড়াতে নিষেধ করলেন। বললেন, 'আমার এক পরিচিত মহিলার তোমার মতই অবস্থা হয়েছিল। কয়েকদিন বেশ কষ্ট পেয়েছে বেচারা। পরে আবার সব ঠিক হয়ে গেছে। তার ডেলিভারিও হয়েছিল একদম নরম্যাল, স্বাস্থ্যবান বাচ্চার মা হয়েছিল সে।'

কিন্তু কোন সান্ত্বনাবাণীতেই কাজ হলো না। ব্যথাটা যেন স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে রোজীর পেটে। ডাক্তারের পরামর্শে সে

এখন দুটো অ্যাসপিরিন খায়। ঘর থেকে এখন আর বেরই হয় না। বাজার-টাজার মিসেস ডি সুজাই করে দেন। প্রতিদিন সকালে ঢাউস গ্লাসে পানীয়টা নিয়ে আসেন তিনি রোজীর জন্য। ওর কিছু লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করেন। রবার্ট ডি সুজাও মাঝে মধ্যে সঙ্গ দিতে আসেন। একদিন এসেছিলেন রানু অধিকারী। রোজী মা হতে যাচ্ছে শুনে তিনি খুব খুশি। বারবার বলছিলেন, 'তোমাকে এখন খুব সুন্দর লাগছে, রোজমেরী।' রোজীর পেটে ব্যথার কথা শুনে তিনি প্রথমে বিস্মিত হয়েছেন, পরে কষ্ট পেয়েছেন।

রোজীকে দেখতে এসেছে এ ফ্ল্যাটের আরও কয়েকজন। এদের কেউ কেউ রানু বা মিসেস ডি সুজার পরিচিত, কেউ বা সেধেই ওকে অভিনন্দন জানিয়ে গেছে, সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে। এদের প্রত্যেকের আচরণ বন্ধুবৎসল, অমায়িক। রোজী ঠিক করেছে সীমান্ত বম্বে থেকে ফিরলে একটা ছুটির দিন দেখে সে তার প্রতিবেশীদের দাওয়াত দিয়ে রান্না করে খাওয়াবে।

এগারো

জুলাই মাসের এক প্রবল বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যায় আলবার্ট ডেভিড বেড়াতে এলেন রোজীদের বাসায়।

'তোমাকে এত রোগা লাগছে কেন?' ভেতরে ঢুকে প্রথমেই এ প্রশ্নটা করলেন তিনি। 'প্রেগন্যান্ট মহিলাদের ওজন বাড়ে, স্বাস্থ্যবতী দেখায়। কিন্তু তুমি দেখছি অনেক শুকিয়ে গেছ—'

'আমার একটা সমস্যা হয়েছে,' ডেভিডকে নিয়ে লিভিংরূমের দিকে যেতে যেতে বলল রোজী। 'খুব পেট ব্যথা করে। রাতে ঘুমাতে পারি না। রাত জাগরণের ক্লান্তি থেকেই হয়তো এমন রোগা লাগছে। যাকগে, কেমন আছেন, বলুন?'

একটা সিঙ্গল সোফায় বসতে বসতে ডেভিড বললেন, 'আছি একরকম। তোমাকে ফোনে অভিনন্দন জানানো ঠিক হবে না ভেবে নিজেই চলে এলাম।'

'খবরটা জানলেন কিভাবে?'

'এসব খবর চাপা থাকে না, জানো না? ভাল কথা, কোন্ ডাক্তারকে দেখাচ্ছ?'

'পি.জি-র রিটায়ার্ড প্রফেসর ডা. মোস্তাফিজুর রহমানকে বলল রোজমেরী। 'উনি—'

'চিনি ওঁকে,' বললেন ডেভিড। 'মানে একবার পরিচয় হয়েছিল। ডোরিসের ডেলিভারি মোস্তাফিজ সাহেবই করেছিলেন।' ডোরিস আলবার্ট ডেভিডের একমাত্র মেয়ে।

'ঢাকার সেরা গাইনোকলোজিস্ট,' বলল রোজী। 'আমাদের প্রতিবেশী মি. এবং মিসেস ডি সুজার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওঁরাই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করিয়ে দিয়েছেন।'

কলিংবেল বেজে ওঠার শব্দে বাধা পেল রোজমেরী। 'এক মিনিট' বলে দরজা খুলল ও। মি. রবার্ট ডি সুজা।

হাসল রোজী। 'আপনি অনেকদিন বাঁচবেন, আঙ্কেল। এইমাত্র আমার এক গেস্টকে আপনাদের কথা বলছিলাম।'

'নিশ্চই নিন্দা করোনি?' উনিও হাসলেন। 'মিনি নিউ মার্কেট যাচ্ছে। তোমার কিছু লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করেছিল।'

'এই বৃষ্টির মধ্যে?' অবাক হলো রোজমেরী।

'বৃষ্টি কমেছে। সীমান্ত কোথায়? ওকে দু'দিন ধরে দেখছি না।'

'ও ওর নতুন ধারাবাহিকের শূটিং-এ ব্যস্ত। তা দাঁড়িয়েই কথা

বলবেন নাকি ভেতরে আসবেন?'

'তোমার গেস্ট আবার বিরক্ত হবেন না তো?'

'আরে না না। আসুন তো!'

আলবার্ট ডেভিডের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল রোজী রবার্ট ডি সুজার।

'আঙ্কেল, ইনি রবার্ট সাহেব,' বলল সে। 'আমাদের সুপ্রতিবেশী এবং সকল বিপদের সবসময়ের বন্ধু। ওঁর কথাই আপনাকে বলছিলাম।'

সাগ্রহে হাত মেলালেন ডেভিড। 'রোজী তো আপনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

'আপনাকে ও নিশ্চই আমার সম্পর্কে বাড়িয়ে বলেছে,' হাসলেন রবার্ট ডি সুজা। 'ওর সুখবরটা জানেন তো?'

'হ্যাঁ, জানি,' বললেন ডেভিড।

'চেষ্টা করি ওর নিয়মিত খবর-টবর নিতে। বুড়ো মানুষ। তেমন কুলিয়ে উঠতে পারি না।'

'রোজী কিন্তু বলেছে আপনারা ওকে আপন মেয়ের মতই দেখেন।'

'ও তো আমাদের মেয়ের মতই। আমাদের মেয়েটা বেঁচে থাকলে এতদিনে রোজমেরীর মতই হত।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রবার্ট ডি সুজা।

প্রসঙ্গ পাল্টাতে রোজী বলল, 'আপনারা বসুন। আমি আপনাদের জন্য চা করে নিয়ে আসি।'

'না রে, মা। এখন চা-টা খাব না। তোমার আন্টি বসে আছেন আমার জন্য। আবার পরে আসব,' উঠে দাঁড়ালেন রবার্ট। সম্মান দেখাতে চেয়ার ছাড়লেন আলবার্ট ডেভিডও। 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে ভাল লাগল।'

'আমারও। তা আসুন একদিন বাসায়। এই তো পাশের

ফ্ল্যাটটাই আমাদের।'

'সময় করে আসব।'

দরজার দিকে এগোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন রবার্ট ডি সুজা। 'তোমার কিছু লাগবে কিনা বললে না তো, মা মণি?'

'ধন্যবাদ, আঙ্কেল। আমার কিছু লাগবে না,' বলল রোজী।

'তুমি ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করছ তো? মিক্সচারটা নিয়মিত খাচ্ছ?'

'জ্বী।'

'কিসের মিক্সচার?' জানতে চাইলেন ডেভিড।

'আন্টি আমার জন্য নানা লতা-পাতা, ডিম ইত্যাদি দিয়ে একটা মিক্সচার তৈরি করেন প্রতিদিন। ওটা নিয়মিত খেলে নাকি ডেলিভারিতে কোন সমস্যা হবে না।'

'কি থাকে মিক্সচারে?'

'অনেক কিছু। একটা গাছের শিকড়ের কথা শুধু মনে পড়ছে। "ট্যানিস রুট" নাম।'

'ট্যানিস?' ভুরু কোঁচকালেন আলবার্ট ডেভিড। 'জীবনে নাম শুনিনি! নাকি ওটা ওরিস রুট?'

'ট্যানিস রুটই,' বললেন রবার্ট।

'এই যে এটার মধ্যেও জিনিসটা আছে,' রোজী জামার ভেতর থেকে রূপোর সেই বলটা বের করে দেখাল। তিনশো বছরের পুরানো কবচ আবার পরতে শুরু করেছে সে মিসেস ডি সুজার অনুরোধে। ডি সুজা ওকে বলেছেন, কবচটা নিয়মিত গলায় না রাখলে পেটের সন্তানের ক্ষতি হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রী হলেও কুসংস্কারে বিশ্বাস করে রোজমেরী। অনাগত সন্তানের জন্য তাই কোন ঝুঁকি নিতে রাজি হয়নি সে। তা ছাড়া এতদিনে পচা গন্ধটা গা সয়েও এসেছে।

বলটা দু'আঙুলের ফাঁকে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে আলবার্ট

ডেভিড বললেন, 'এটাকে দেখে তো কোন গাছের শিকড় মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে ফাংগাস জাতীয় কিছু।' রবার্টের দিকে তাকালেন তিনি। 'অন্য কোন নাম আছে নাকি এটার?'

'আমি যতদূর জানি, নেই,' জবাব দিলেন রবার্ট।

'এনসাইক্লোপেডিয়াটা একটু ঘেঁটে দেখতে হবে,' বললেন ডেভিড। 'হয়তো ওর মধ্যে আপনার "ট্যানিস রুট" সম্পর্কে তথ্য থাকবে।' চেনটা আবার ঢোলা ম্যাক্সির ফাঁকে পুরে রোজী বলল, 'এটা হচ্ছে বিপত্তারিণী কবচ, তাই না, আঙ্কেল?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন রবার্ট। 'ওটা তোমাকে প্রটেকশন দেবে সব ধরনের বিপদ থেকে।'

আলবার্ট ডেভিড কি যেন বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেলেন। মি. রবার্ট ব্যস্ত হয়ে বললেন। 'দেরি হয়ে গেল অনেক। এবার তাহলে আসি, মি. ডেভিড।'

'আচ্ছা,' অন্যমনস্ক গলায় বললেন ডেভিড। কি যেন ভাবছেন তিনি।

রবার্ট ডি সুজা চলে যাবার পরে ডেভিড রোজীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমাকে একটা কবচের কথা বলেছিলে। এটাই কি সেটা?'

'হ্যাঁ। আঙ্কেল।'

'ওটা তুমি আবার গলায় পরতে শুরু করেছ? বলেছিলাম না জিনিসটা ভাল না? আর ওসব গলায় ঝুলিয়ে কোন লাভও নেই।'

'কিন্তু রবার্ট আঙ্কেল এবং মিনি আন্টি খুব চেঁচামেচি করেন এটা গলায় না পরলে।'

'হুম্। তোমার এই আঙ্কেল কি করেন, বলো তো?'

'এখন কিছুই করেন না। আগে জাহাজে কাজ করতেন। অনেক দেশ ঘুরেছেন।'

'হুম। তোমার আঙ্কেলের একটা জিনিস খেয়াল করেছ?'

'কি?'

আলবার্ট ডেভিড জবাব দেয়ার আগেই কারেন্ট চলে গেল।

'ওহ্, আবার সেই লোড শেডিং।' হতাশ হয়ে বলল রোজী।

'তোমাদের এদিকেও ঘন ঘন লোড শেডিং হচ্ছে নাকি?'

'জ্বী। গতকাল থেকে আবার জেনারেটর নষ্ট। বিশ্রী অবস্থা। আপনি বসেন। আমি মোম নিয়ে আসি।'

কয়েক মিনিট পরে মোম জ্বেলে আনল রোজী, রাখল টি-টেবিলের ওপর।

'তোমার মোমদানিটা খুব সুন্দর,' বললেন আলবার্ট ডেভিড। 'কিন্তু মোমগুলো কালো কেন?'

'রবার্ট আঙ্কেল গিফট দিয়েছেন,' বলল রোজী। 'এগুলো তাঁদের ঘরে তৈরি মোম। অনেকক্ষণ জ্বলে। বাজারের পচা মোম না। বাসায় আরও আছে।'

'সবগুলোই কি কালো?'

'হ্যাঁ,' বলল রোজী। 'কেন?'

'এমনি কৌতূহল,' রূপোর মোমদানিতে ইঞ্চি পাঁচেক লম্বা, বৃত্তাকারে সাজানো ডজনখানেক মোমের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন ডেভিড। 'এরকম জিনিস এর আগে কখনও দেখিনি তো তাই জানতে চেয়েছি। যাকগে, তোমার প্রতিবেশীদের গল্প করো, শুনি। মিসেস ডি সুজা কোথায় লতা-পাতা জন্মান? উইন্ডো বক্সে?'

'তার আগে আপনার জন্য চা নিয়ে আসি?' জিজ্ঞেস করল রোজমেরী।

'অন্ধকারে তোমার অসুবিধে হবে না?'

'মোটেও না। ফ্লাস্কে জল গরম করা থাকে সবসময়। আমি নিয়ে আসছি এখুনি।'

গরম চায়ের কাপে তৃপ্তির সাথে মাত্র চুমুক দিয়েছেন আলবার্ট ডেভিড, এমন সময় কে যেন দ্রুত কড়া নাড়ল দরজায়।

'নির্ঘাত সীমান্ত এসেছে,' বলল রোজী। 'ওর কড়া নাড়ার শব্দ শুনলেই বুঝতে পারি।'

হ্যাঁ, সীমান্তই। সে রুমাল দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, আঙ্কেল আপনি! কেমন আছেন?'

মৃদু হাসলেন ডেভিড, 'ভালই। তোমার খবর কি? শুনলাম নতুন সিরিয়ালে কাজ করছ?'

'জ্বী। সব আপনাদের দোয়া। ফিল্মে অভিনয়েরও অফার এসেছে। মতিন রহমানের ছবি।'

'বেশ বেশ। খুব ভাল লাগল শুনে। তোমার তো এখন সুখের সাগরে ভাসবার সময়। গর্বিত পিতা হতে চলেছে...'

'খবরটা জানেন তাহলে! আপনি তো আমাদের বাড়িতে আসা বাদই দিয়েছেন।'

'সময় করতে পারি না রে, ভাই। প্রেততত্ত্বের ওপর লেখাটা এখনও ধরতেই পারিনি। ভাল কথা, তোমাদের প্রতিবেশী ডি সুজা সাহেবের সাথে পরিচয় হলো।'

'বেশ লোক, না?'

'হ্যাঁ। ভালই। তবে কি জানো, একটা ব্যাপারে আমার বেশ খটকা লেগেছে।'

'কোন্ ব্যাপারে?'

'তোমরা কি লক্ষ করেছ রবার্ট ডি সুজার দুটো কানই সূচালো?'

'না তো!' অবাক হয়ে বলল রোজী।

'তাতে কি হয়েছে?'

'অমন সূচালো কান সচরাচর দেখা যায় না। মিথ কি বলে জানো—প্রেতসাধক বা শয়তানদের অমন কান হয়।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সীমান্ত, 'আঙ্কেল, হরর গল্প লিখে আসলে আপনি সবাইকে হরর ভাবতে শুরু করেছেন। সুজা সাহেবের মত মানুষই হয় না। আপনি তাঁকে শয়তান ঠাউরে বসেছেন শুনলে তিনি মনে যে কি কষ্ট পাবেন!'

আঁতকে উঠলেন ডেভিড। 'সর্বনাশ! তুমি আবার ওঁকে ও কথা বলতে যেয়ো না। তাহলে এ বাড়িতে আসাই বন্ধ হয়ে যাবে।'

হাসি থামাল সীমান্ত। 'না, বলব না। একটা কথা কি জানেন—এখানে সাত মাসের বেশি হলো এসেছি। এখনও কিন্তু কোন হরর ঘটনা ঘটেনি। অথচ আপনি কি ভয়টাই না দেখিয়েছিলেন বেচারা রোজকে।'

'না ঘটলেই তো ভাল। কি বলো?' সমর্থনের আশায় ডেভিড চাইলেন রোজীর দিকে। রোজী মাথা ঝাঁকাল।

উঠে দাঁড়ালেন আলবার্ট ডেভিড। বললেন, 'অনেক গল্প হলো। আজ আসি। রোজী, আমার রেইনকোটটা একটু এনে দেবে, প্লীজ?'

রোজী সীমান্তর দিকে মিনতির দৃষ্টিতে তাকাল। 'আমার পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে। তুমি কষ্ট করে একটু এনে দাও না?'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সীমান্ত।

'ক্লজিটের পাশে।'

সীমান্ত চলে যেতে ডেভিড প্রশ্ন করলেন, 'বাচ্চার নাম-টাম ঠিক করেছ কিছু?'

রোজী বলল, 'ছেলে হলে আদিত্য, মেয়ে হলে অদিতি।'

'বাহ্, সুন্দর নাম। তুমি কি চাইছ? ছেলে না মেয়ে?'

'সীমান্তর ইচ্ছে ছেলে। আমি মেয়ে হলেই খুশি।'

ইতিমধ্যে সীমান্ত ফিরে এসেছে রেইনকোট নিয়ে। ওকে ধন্যবাদ দিয়ে কোটটা গায়ে চাপালেন আলবার্ট ডেভিড। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টির বেগ আবার বেড়েছে। তিনি বাইকে চেপে

এসেছেন।

ডেভিড রেইনকোর্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভুরু কোঁচকালেন। বললেন, 'রোজী, দেখো তো আমার একটা গ্লাভস কোথাও পড়ে-টড়ে গেছে কিনা।'

রোজী ভাল করে খুঁজে দেখল মেঝে এবং সোফার নিচেটা। সীমান্ত কুজিট খুঁজল। ফিরে এসে বলল, 'সরি, আঙ্কেল। আপনার গ্লাভসের চেহারা দেখলাম না কোথাও।'

'তাহলে বোধহয় বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে ফেলে এসেছি। ওখান থেকে সরাসরি তোমাদের এখানে এসেছিলাম। আচ্ছা, অসুবিধে নেই। আমি একবার কেন্দ্রে খোঁজ নিয়ে দেখব।'

'আর ট্যানিস রুট সম্পর্কেও কিন্তু খোঁজ-খবর নিয়ে আমাকে জানাবেন,' বলল রোজী।

'আচ্ছা জানাব।'

হপ্তা খানেক পরে, রাত সাড়ে দশটার দিকে ফোন বেজে উঠল রোজীদের ঘরে। তখন রোজী শুয়ে শুয়ে 'সাপ্তাহিক ২০০০' পড়ছে আর সীমান্ত বিটিভিতে ধারাবাহিক 'ফুগল বন্দী' দেখছে। ফোন ধরল সীমান্ত। কয়েক সেকেন্ড পরে বলল, 'রোজ, তোমার ফোন। ডেভিড আঙ্কেল করেছেন।'

রোজী কানে রিসিভার লাগাল। 'হ্যালো?'

'শোনো, রোজমেরী,' ব্যস্ত কণ্ঠ ভেসে এল আলবার্ট ডেভিডের। 'তুমি কি বের-টের হও নাকি বাইরে যাওয়া নিষেধ?'

'আজকাল খুব বেশি কাজ না থাকলে বের হই না,' বলল রোজী। 'কেন?'

'তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে আমার। কাল সকাল এগারোটায় ব্রিটিশ কাউন্সিলে একবার আসতে পারবে?'

'কি ব্যাপার বলুন তো? ফোনে বলা যাবে না?'

'না না। মুখোমুখি কথা বলা দরকার। তোমার কি খুব অসুবিধে হবে?'

'না। তেমন অসুবিধে নেই।'

'গুড। তাহলে কাল এগারোটার সময় ব্রিটিশ কাউন্সিলের ভিডিও রুমে থেকো।'

'থাকব। আচ্ছা, আপনার গ্লাভস পেয়েছেন?'

'না। কেন্দ্রে খোঁজ করেছিলাম। ওরা বলল কোন গ্লাভস ওদের চোখে পড়েনি। যাকগে, আমি নতুন আরেক জোড়া কিনে নিয়েছি। তাহলে ওই কথাই রইল, রোজী। নাউ গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

ফোন রেখে দিল রোজী।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল সীমান্ত।

'আঙ্কেল কাল সকালে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে দেখা করতে বলেছেন। খুব নাকি জরুরী।'

'কোনও আভাস দেননি?'

'একটা কথাও না।'

হাসল সীমান্ত। 'দেখো, আবার কোন্ ভূতুড়ে গল্প শুনিয়ে দেয় তোমাকে।'

প্রত্যুত্তরে হাসল রোজীও, কোন মন্তব্য করল না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সীমান্ত। বলল, 'ডার্লিং, খুব আইসক্রীম খেতে ইচ্ছে করছে। খাবে নাকি?'

'এত রাতে দোকান খোলা পাবে?'

'নিচের দোকানটা রাত বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে। আমি "কোন্" খাব। তুমি?'

'ভ্যানিলা।'

'ঠিক আছে। আমি যাব আর আসব।'

বের হয়ে গেল সীমান্ত। আবার বালিশে হেলান দিল রোজী।

ডেভিড আঙ্কেল কী এমন বিষয় নিয়ে জরুরী কথা বলতে চান? ভাবতে চেষ্টা করল ও। কিন্তু শত ভেবেও কিছুই ঠাহর করতে পারল না। শুনল রবার্ট ডি সুজাদের কলিংবেল বাজছে। সম্ভবত সীমান্ত। নির্ঘাত বলতে গেছে সে আইসক্রীম কিনতে যাচ্ছে। তাঁদের জন্য কি আনবে। সত্যি, ডি সুজারা যাদু করেছেন তার স্বামীকে। মনে মনে হাসল রোজী।

ঠিক তখন ব্যথার তীক্ষ্ণ একটা ছুরি খচ করে বিঁধল তলপেটে।

বারো

পরদিন সকাল পৌনে এগারোটায় ব্রিটিশ কাউন্সিলে গিয়ে হাজির হলো ফ্লোরা রোজমেরী। সাভারে শূটিং ছিল সীমান্তর। যাবার সময় ওকে নামিয়ে দিয়ে গেছে।

অপেক্ষা করাই সার হলো। সাড়ে এগারোটার সময়ও যখন এলেন না আলবার্ট ডেভিড, উদ্বিগ্ন বোধ করল রোজী। ভদ্রলোক কথা দিয়ে কথা না রাখার মানুষ নন। তাহলে কি কোন সমস্যা হলো? ফোন করে খবর নেয়া দরকার।

নিউ মার্কেটের সামনে, পোস্ট অফিস লাগোয়া একটা কার্ডফোনের দোকান আছে। ইচ্ছে করলে ব্রিটিশ কাউন্সিলের রিসেপশনিস্টকে অনুরোধ করলে ফোন করা যেত। কিন্তু ইচ্ছে করেনি রোজীর। ওর পার্সে সবসময় একটা ফোন কার্ড থাকে। সে নির্ধারিত নম্বরে ফোন করল। ও প্রান্তে এক মহিলা সাড়া দিলেন, 'হ্যালো?'

'এটা কি আলবার্ট ডেভিড সাহেবের বাসা?'

'জ্বী। আপনি কে বলছেন, প্লীজ?' ভদ্র মহিলার গলা শুনে মনে হলো চল্লিশোর্ধ্ব কেউ হবেন।

রোজী বলল, 'আমার নাম রোজমেরী হাসান। ডেভিড সাহেবের সাথে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল সকাল এগারোটায়। কিন্তু উনি তো এখনও এলেন না। উনি কোথায় গেছেন বলতে পারবেন?'

অপর পক্ষ হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। 'হ্যালো?' ডাকল রোজী।

'ডেভিড আপনার কথা আমাকে বলেছে, রোজমেরী,' সাড়া দিলেন ভদ্রমহিলা। 'আমার নাম সারাহ্ ডেভিড। ডেভিডের ফুপাত বোন। ও হঠাৎ গত রাতে, তিনটার দিকে সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

হার্টের একটা বিট মিস করল রোজীর। ঢোক গিলে বলল, 'অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?'

'হ্যাঁ। সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে আছে। ডাক্তাররা এখনও অসুস্থতার কারণ ধরতে পারেননি। ও মেডিনোভাতে দশ নম্বর কেবিনে আছে।'

'মাই গড!' ফিসফিস করে বলল রোজী, 'কাল রাতেও মানুষটার সঙ্গে কথা বললাম। তখনও তো উনি সুস্থ ছিলেন।'

'আমিও তো ওকে সুস্থ দেখেছি। রাত তিনটার দিকে "আমার বুক জ্বলে গেল" বলে চিৎকার দিতে থাকে ডেভিড। মুখ দিয়ে ফেনা বেরোতে থাকে। তারপর হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায় সে। আমরা ফোন করে মেডিনোভা থেকে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে পাঠাই।'

'আঙ্কেল কেন অজ্ঞান হয়ে গেলেন ডাক্তাররা কিছুই বলতে পারেননি?'

'না। তবে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।'

'এর আগে কখনও হয়েছে এরকম?'

'না।' বললেন সারাহ্। 'আমি এখন হাসপাতালে যাচ্ছি। আপনার নাম্বারটা আমাকে দিন। কোন খবর থাকলে জানাব।'

'তাহলে খুবই ভাল হয়।' রোজী তার অ্যাপার্টমেন্টের নাম্বার দিয়ে জানতে চাইল এই মুহূর্তে তার কিছু করণীয় আছে কিনা।'

'না, ধন্যবাদ,' বললেন সারাহ্। 'আমি ডেভিডের মেয়েকে খবর দিয়েছি। সে আসছে। আর কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে বলব।'

দারুণ মন খারাপ করে বাড়িতে ফিরে এল রোজী। আলবার্ট ডেভিড তার লতায়-পাতায় আত্মীয় হলেও তা কখনও বুঝতে দেননি। সীমান্তকে বিয়ে করার পরে রোজমেরীকে তার বাবা-মা-আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করলেও ডেভিড আঙ্কেল কখনও কষ্ট দেননি ওর মনে। বট বৃক্ষের ছায়া ছিলেন যেন তিনি। সেই মানুষটার হঠাৎ কি হলো?

লিফট থেকে বেরুতে মিসেস ডি সুজার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কোথাও যাচ্ছেন তিনি। রোজীকে দেখে বললেন, 'কি ব্যাপার, রোজমেরী? তোমার মুখ-চোখ এত শুকনো কেন? সকালে মিকশ্চার নিয়ে গিয়ে দেখি তোমরা বাসায় নেই। দরজায় তালা মারা। কি হয়েছে? কোথায় গিয়েছিলে?'

'আমার মনটা খুব খারাপ, আন্টি,' ম্লান গলায় বলল রোজী। 'আমার এক আত্মীয় খুব অসুস্থ। হাসপাতালে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।'

'সে কি!' বললেন মিসেস ডি সুজা। 'কে অসুস্থ?'

'ওঁর নাম আলবার্ট ডেভিড,' বলল রোজী।

'রবার্টের সঙ্গে গত শনিবার যাঁর পরিচয় হয়েছিল সেই ভদ্রলোক? কি হয়েছে তাঁর?'

রোজী সব কথা খুলে বলল তাঁকে।

শুনে আফসোস করতে লাগলেন মিসেস ডি সুজা। 'আহারে, আমার বন্ধু আভা পল গুডাও এভাবে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। বেশ কয়েকদিন "কোমা"র মধ্যে থেকে মারা যায় সে। প্রার্থনা করি তোমার আঙ্কেল যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। তোমার শরীর ঠিক আছে তো, মা?'

'একটু একটু পেট ব্যথা আবার শুরু হয়েছে। আপনার মিকশ্চারটা সকালে খাইনি এ জন্যেই কি?'

'ওটা দিনের যে কোন এক সময় খেলেই হলো। খাবে এখন?'

'না না। আপনি কাজে যাচ্ছেন। এখন থাক।'

'ঠিক আছে। আমি ফিরে এসে তোমাকে মিকশ্চার দেব'খন। গুডবাই, রোজমেরী।'

মিসেস ডি সুজা ওর দিকে হাত নেড়ে লিফটে উঠলেন। রোজী ক্লান্ত ভঙ্গিতে এগোল নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে।

তেরো

অলস সময় কাটছে রোজীর। সকালে উঠে নাস্তা তৈরি করা, খবরের কাগজে চোখ বুলানো, দুপুরে হেঁশেলে ঢোকা তারপর বিকেলে ঘুম। সীমান্ত এখন বড্ড ব্যস্ত। নজরুল সিদ্দিকী নামের একজন প্রযোজক আছেন ওদের ফ্ল্যাটে, তাঁর সাথেও বেশ ভাব হয়ে গেছে সীমান্তর। তিনি নাকি সীমান্তকে নায়ক করে সিনেমা তৈরির চিন্তাভাবনা করছেন। গত কয়েকমাসে প্রতিবেশীদের অনেকের সাথেই পরিচয় হয়েছে রোজমেরীর। পাঁচতলায় থাকেন রিটায়ার্ড

ডেন্টিস্ট রোজারিও ডি কস্টা। ইনিই রোজীর গলার চেনটা বানিয়েছেন। মিসেস ডি সুজা বলেছিলেন তাদের বন্ধুটি বেশ মিশুকে স্বভাবের। মিছে বলেননি। তাঁর সাথে কথা বলে ভালই লেগেছে রোজীর। চারতলায় ফ্লোরেন্স এবং লাভলী গোমেজ নামে দুই বোন থাকেন। একজন কলেজে পড়ান, অন্যজন ফার্মাসিস্ট। কেউই বিয়ে করেননি। লাভলীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হলো একটা নাদুস নুদুস কালো বেড়াল। বলা বাহুল্য, মিসেস ডি সুজাই ওঁদের সাথে রোজীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। কালো বেড়ালটার জ্বলজ্বলে চাউনি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল রোজী। লাভলী অবশ্য অভয় দিয়ে বলেছেন, লেটুসকে (বেড়ালের নাম আবার লেটুস হয় নাকি!) ভয় পাবার কোন কারণ নেই। সে খুব লক্ষ্মী মেয়ে।

রোজী একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে তার মা হবার খবর শোনার পরে এ অ্যাপার্টমেন্টের অনেকেই সেধে তার সঙ্গে দেখা করেছে, কুশল জানতে চেয়েছে। একবার ডা. মোস্তাফিজুর রহমান এসেছিলেন রোজীর বাসায়। এ বাড়ির সবার সঙ্গেই তাঁর ভাব।

আলবার্ট ডেভিডকে দেখতে ইতিমধ্যে দু'বার হাসপাতালে গেছে রোজী। ডেভিডের মেয়ে ডোরিসও এসেছে। বয়সে সে রোজীর চেয়ে দু'এক বছরের বড় হলেও মুটিয়ে গেছে অনেক। ডেভিডের অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। এখনও 'কোমা'র মধ্যে আছেন তিনি। তাঁকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে রোজীর। তবে একদিন একটা কাণ্ড ঘটিয়ে নিজেকে নিয়েই প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল রোজী।

সেটা ছিল মঙ্গলবারের এক রাত। তিনটে বা সাড়ে তিনটে হয়তো হবে। রোজী জানে না কখন সে ফ্রিজ খুলেছে আর কখনোই বা রক্ত জমাট বাঁধা মুরগীর কলিজা খেতে শুরু করেছে। মুখে হঠাৎ বিস্বাদ ঠেকতে হাতের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সে। পেট উগরে বমি এল। তাড়াতাড়ি মাংসের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে

বেসিনে গেল ও। বারবার মুখ কুলকুচো করেও বমি ভাবটা গেল না। মনে পড়ল ডাক্তার বলেছিলেন অনেক অদ্ভুত জিনিস খেতে মন চাইবে রোজীর। তাই বলে কাঁচা মাংস? ওয়াক থু!

পরদিনই ডাক্তার মোস্তাফিজুর রহমানকে ঘটনাটা জানাল রোজী। তিনি শুনে হাসলেন। 'ঘাবড়াবার কিছু নেই, রোজমেরী,' বললেন ডাক্তার। 'আমি এক মহিলাকে চিনি, তিনি মাঝে মাঝে কাগজ খেয়ে ফেলতেন। আর কাঁচা মাংস খেয়ে ফেলেছেন বলে ভয় পাচ্ছেন? এক সময়, মানুষ যখন আগুন জ্বালাতে পারত না তখন কিন্তু কাঁচা মাংসই খেত। হাঃ হাঃ হাঃ' খুব হাসতে লাগলেন তিনি। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, মিসেস হাসান, আপনি কি খুব দুশ্চিন্তা করেন বা টেনশনে ভোগেন?'

'না। মানে...'

'বেশি টেনশন করবেন না। সবসময় হাসিখুশি থাকবেন। নানা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন। পার্টিতে যাবেন। সম্ভব হলে নিজের বাড়িতেও পার্টি দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। দেখবেন মন ভাল থাকলে আর কোন সমস্যা হবে না।'

ডাক্তারের চেম্বার থেকে ফেরার পথে রোজী সিদ্ধান্ত নিল সে বাড়িতে একটা পার্টি দেবে। প্রতিবেশীরা তার জন্য কত সহমর্মিতা প্রকাশ করে, রোজীর অবশ্যই উচিত কৃতজ্ঞতা দেখানোর জন্য একদিন সকলকে দাওয়াত করে খাওয়ানো। রোজী ঠিক করল সীমান্তকে নিয়ে সে দু'একদিনের মধ্যেই বসবে। কাকে দাওয়াত দেয়া যায় তার একটা লিস্ট করতে হবে।

চোদ্দ

পুরো একটা হপ্তা গেল ফ্লোরা রোজমেরীর পার্টি নিয়ে নানা পরিকল্পনা করতে। কাকে কাকে দাওয়াত দেবে, কি খাওয়াবে এ নিয়ে মেতে রইল স্বামী-স্ত্রী। সীমান্তও বেশ খুশি গেট টুগেদারে। তবে সে একটা শর্ত জুড়ে দিল ছয় মাসের পেট নিয়ে রোজীর রান্না করা চলবে না। সীমান্ত কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। সে আলাউদ্দিন রোডের মোসলেম বাবুর্চিকে ভাড়া করবে। মোসলেমই রান্নার দায়িত্ব নেবে। প্রথমে রাজি হতে চায়নি রোজী। তার যুক্তি ঘরোয়া দাওয়াতে কেউ মেহমানদের বাবুর্চির হাতের রান্না খাওয়ায় না। কিন্তু সীমান্ত সাফ বলে দিল কোন অবস্থাতেই রোজীর রান্নাঘরে ঢোকা চলবে না। রোজীও তার জিদ ছাড়বে না। শেষে রফা হলো দুটি স্পেশাল ডিশ, চিংড়ি মাছের মালাইকারী এবং সব্জী পোলাও রোজী দেখিয়ে দেবে, মোসলেম বাবুর্চি তার নির্দেশ মত রান্না করবে।

শুক্রবারের এক সন্ধ্যায় রোজীদের বাড়িতে জম্পেশ পার্টিটা হলো। রোজী এবং সীমান্ত তাদের পরিচিত প্রায় সবাইকেই দাওয়াত দিল। এদের প্রায় সকলেই এলেন দাওয়াত খেতে। রোজী ঢাকায় তার ভার্সিটির যে দু'একজন বান্ধবী ছিল তাদেরকেও দাওয়াত দিল। এদের মধ্যে সবচে' ঘনিষ্ঠ সীমা, এক সুযোগে রোজীকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে জানতে চাইল, খালু ও খালাম্মা, অর্থাৎ রোজীর বাবা-মা তার মা হবার খবরটা জানেন কিনা।

রোজী চেহারা ম্লান করে বলল, 'আমি বাড়িতে চিঠি দিয়েছিলাম। তুই তো জানিসই বাবা আমার মুখ দেখতেও চান না। আর মা বাবাকে ভয় পান যমের মত। তারপরও তিনি লুকিয়ে আমার চিঠির জবাব দিয়েছেন। এ সময় আমার পাশে থাকার খুব ইচ্ছে তাঁর। কিন্তু মা'র পক্ষে অসুস্থ শরীর নিয়ে একা আসা তো সম্ভব নয়।'

'তুই ভাবিস না, রোজ,' বলল সীমা। 'তোর বাবার পাষাণ হৃদয় নিশ্চই গলবে। দেখিস, একদিন নিজেই তিনি চলে এসেছেন তোর কাছে।'

'দোয়া করিস, ভাই,' করুণ গলায় বলল রোজী।

'কিন্তু তুই এত শুকিয়ে গেছিস কেন?' অবাক হলো সীমা। 'যেন অনেকদিন খেতে পাসনি!'

'জানি না,' কাঁদো কাঁদো গলা রোজীর। 'জানিস, প্রায় সারাক্ষণ পেটে ব্যথা করে।'

'কোন্ ডাক্তারকে দেখিয়েছিস?'

ডাক্তারের নাম বলল রোজী।

'ডাক্তার কি বলেছে?'

'বলেছেন ব্যথা থেমে যাবে।'

'আমার মনে হয় অন্য কাউকে তোর দেখানো উচিত,' সহানুভূতির সুরে বলল সীমা।

'মোস্তাফিজ সাহেব তা চান না। খালি বলেন আমি যেন কারও পরামর্শে কান না দেই।'

'অদ্ভুত তো! শোন্, রোজী, আমি বলি কি, তুই অন্য কোন ডাক্তারকে দেখা।'

'আমি মেডিকেলের শায়লা বেগমকে প্রথম দেখিয়েছিলাম। পরে অন্য সবার পরামর্শে...'

'শায়লার কাছেই আরেকবার যা।'

'বলছিস?'

'হ্যাঁ।'

রোজী জবাবে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, দেখল সীমান্ত আসছে। সে চেঁচিয়ে বলল, 'আরে, তুমি এখানে? ওদিকে সবাই তোমাকে খুঁজছে। কি করছ এখানে?'

'গোপন কথা বলছি,' হাসল সীমা। 'যা পুরুষদের শোনা নিষেধ।'

'কথা কি শেষ নাকি শুরু?'

'আপাতত শেষ।'

'তাহলে, প্লীজ, চলুন। সত্যি সবাই আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

পার্টি শেষ হতে হতে রাত সাড়ে বারোটা বেজে গেল। নোংরা বাসন-পত্র, টিস্যু আর পোড়া সিগারেটে উপচে পড়া অ্যাশট্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সীমান্ত বলল, 'খাইছে আমারে! এত্তোগুলান জিনিস সরামু কেমনে?'

হেসে ফেলল রোজী। 'তোমার সরাতে হবে না। আমি দেখছি।'

'আরে না না। তোমার এমনিতেই পেটে ব্যথা! তাছাড়া আজ অনেক কাজ করেছ। এখন একটু বিশ্রাম নাও তো।' সে জোর করে স্ত্রীকে একটা সোফায় বসিয়ে দিয়ে নিজেই বাসন তুলতে শুরু করল।

ওর কাজ দেখতে দেখতে রোজী ডাকল, 'সীমান্ত?'

'বলো?'

'কাল সকালে আমি শায়লা বেগমের কাছে যাব।' কিছু বলল না সীমান্ত, শুধু মুখ তুলে চাইল।

'আমি শায়লা আপাকে দিয়ে পরীক্ষা করাব,' বলল রোজী। 'আমার মনে হয় মোস্তাফিজ সাহেব কিছু একটা লুকোচ্ছেন আমার কাছ থেকে। এভাবে ননস্টপ কারও ব্যথা থাকে নাকি?'

'রোজমেরী,' বলল সীমান্ত।

'আর মিসেস ডি সুজার মিকশ্চারও খাব না,' বলে চলল ও। 'আমার ভিটামিন ট্যাবলেট দরকার, সবাই যা খায়। আমি গত তিনদিন ধরে পানীয়টা খাচ্ছি না। মিসেস ডি সুজা মিকশ্চার রেখে যাচ্ছেন। আমি পরে ফেলে দিচ্ছি।

'তুমি—'

'পরিবর্তে আমি নিজেই নিজের ড্রিঙ্ক তৈরি করে নিচ্ছি,' বলল রোজী।

বিস্ময় আর রাগে বিস্ফারিত হয়ে উঠল সীমান্তের দুই চোখ। সে চিৎকার করে উঠল, 'ওই সীমা মাগী তোমাকে তাহলে এই বুদ্ধি দিয়েছে? ডাক্তার বদলানোর কু পরামর্শ দিয়েছে?'

'সীমা আমার বন্ধু,' রেগে গেল রোজী। 'ওকে মাগী-ছাগী বলবে না।'

'বলব না তো কি করব? বাংলাদেশের সেরা ডাক্তার তোমাকে দেখছেন, রোজমেরী। আর তুমি কিনা কোথাকার কোন্ শায়লা-ফায়লার কাছে যাবার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছ!'

'মোস্তাফিজুর রহমানের স্তুতি শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত,' প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড় হলো রোজমেরীর, 'ব্যথা শুরু হবার পর থেকে আমাকে উনি গৎ বাঁধা সান্ত্বনার বুলি শুনিয়ে আসছেন।'

'তুমি কোন শায়লা বেগমের কাছে যাচ্ছ না,' কঠোর শোনাল সীমান্তর কণ্ঠ। 'একদিকে মোস্তাফিজ সাহেবকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিচ্ছি। এখন আবার শায়লা বেগমকেও দিতে হবে। প্রশ্নই ওঠে না।'

'আমি ডাক্তার চেঞ্জ করব না তো,' বলল রোজী, 'শুধু শায়লা বেগমকে দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ চাইব।'

'আমি তোমাকে যেতে দেব না,' বলল সীমান্ত। 'তাহলে মোস্তাফিজ সাহেবের সাথে অবিচার করা হবে।'

'অবিচার করা হবে? কিসের অবিচার করা হবে শুনি?'

'শায়লার কাছে যেতে চাইলে যাও। তার আগে মোস্তাফিজ সাহেবকে তোমার জানাতে হবে।'

'আমি শায়লা বেগমের কাছেই যাব,' গোঁ ধরে থাকল রোজী। 'তুমি যদি টাকা দিতে না চাও তাহলে আমি নিজেই—'

হঠাৎ থেমে গেল ও, যেন প্যারালাইজড় হয়ে পড়েছে, মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে থাকল।

'রোজ?' ডাকল সীমান্ত।

থেমে গেছে ব্যথাটা। চলে গেছে। যেন অটো একটা হর্ন ক্রমাগত বাজতে বাজতে হঠাৎ থেমে গেছে। অসহ্য ব্যথাটা আর যন্ত্রণা দেবে না ওকে, ঈশ্বরকে হাজার ধন্যবাদ।

'রোজ?' এক পা বাড়ল সীমান্ত, উদ্বিগ্ন।

'থেমে গেছে ওটা,' বলল রোজী। 'চলে গেছে ব্যথা।'

'থেমে গেছে?'

'এইমাত্র,' হাসার চেষ্টা করল রোজী। 'হঠাৎ চলে গেল।' চোখ বন্ধ করল ও, বুক ভরে শ্বাস নিল।

চোখ খুলে দেখল সীমান্ত এখনও ওর দিকে শঙ্কিত চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে।

'তুমি যে ড্রিঙ্কটা বানিয়ে খাচ্ছ ওর মধ্যে কি কি দিয়েছ?' জিজ্ঞেস করল সীমান্ত।

বুকটা হঠাৎ খালি খালি লাগল রোজীর। পেটের বাচ্চাটাকে ও নির্ঘাত মেরে ফেলেছে। বাচ্চাটা মরে গেছে বলেই ব্যথা চলে গেছে। বাচ্চাটার জন্যই সে ব্যথাটা পেত। নিজের নির্বুদ্ধিতা আর জেদের কারণে সন্তানকে হারাতে হলো ওর।

'ডিম,' কাঁপা গলায় বলল রোজী। 'দুধ, ক্রিম, মিষ্টি,' চোখে

পানি এসে গেছে। 'আর শেরী।'

'কতটা শেরী?'

রোজীর ভেতরে কিছু একটা নড়ে উঠল।

'অনেকটা?'

আবার আলোড়নটা টের পেল রোজী, মৃদু চাপ পড়ছে পেটে। খিলখিল করে হেসে উঠল ও।

'আল্লার কসম, রোজমেরী, কতটা?'

'বেঁচে আছে ও,' হাসছে রোজী। 'আবার নড়তে শুরু করেছে। মরেনি আমার সন্তান। বেঁচে আছে!' ফোলা পেটের দিকে তাকাল সে, হালকাভাবে স্পর্শ করল। নড়ছে ওটা, দুটো হাত অথবা পা, একটা এদিকে, অন্যটা ওদিকে।

সীমান্তর হাত ধরল রোজী, পেটের ওপর রাখল। 'টের পাচ্ছ?' ব্যাকুল গলায় বলল ও। 'আমার বাবু নড়ছে। টের পাচ্ছ তো?'

'হ্যাঁ,' বলল সীমান্ত। 'পাচ্ছি।' ঝাঁকি মেরে হাতটা সরিয়ে নিল সে। চেহারা বিবর্ণ।

'ভয়ের কিছু নেই,' খিলখিল করে হেসেই চলেছে রোজী। 'ও তোমাকে কামড়ে দেবে না।'

'অনুভূতিটা অন্যরকম,' বলল সীমান্ত।

'ঠিক তাই, না?' পেটে হাত রেখে আবার তাকাল রোজী। 'ও জ্যান্ত। লাথি মারছে।'

'আমি কিচেনে গেলাম,' এক গাদা থালা-বাটি নিয়ে পা বাড়াল সীমান্ত।

ওর দিকে নজর নেই রোজীর। সে হাসছে আর বলছে, 'ঠিক আছে আমার অদিতি বা আদিত্য, আর লাথি দেয় না, সোনা। পৃথিবীতে আসতে এখনও তিন মাস বাকি। এখনই সব শক্তি যেন খরচ করে ফেলো না! আর বাবাকে বলো সে যেন হুট করে এভাবে

আর রেগে না যায়।'

হাসছে রোজী। হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলল ও দু'হাতে গোল পেটটাতে পরম মমতায় হাত বোলাতে বোলাতে।

পনেরো

ব্যথাটা চলে যাবার পরে আশ্চর্য সুখময় হয়ে উঠল রোজীর জীবন। অনেকদিন ঘুমাতে পারেনি সে। এখন টানা দশ ঘন্টা ঘুমায় রোজী। আগে খাওয়া-দাওয়ায় অরুচি ছিল ওর। এখন খিদে বেড়েছে, খেতেও পারছে পছন্দের ডিশগুলো। গর্ভবতী মহিলারা যেমন হয় তেমনি হয়ে উঠল রোজী; গোলগাল, স্বাস্থ্যবতী এবং আগের চেয়ে সুন্দরী।

মিসেস ডি সুজার নিদ্রিঙ্কার মিকশ্চার এখন চেটেপুটে খায় সে। পেটের বাচ্চাটাকে প্রায় মেরে ফেলার জোগাড় করেছিল এই অপরাধবোধ থেকে পানীয়টা আরও বেশি করে খায় যেন রোজী। ইদানীং মিকশ্চারের সাথে সাদা রঙের এক ধরনের মিষ্টি কেকও নিয়ে আসেন মিসেস ডি সুজা। বিনাবাক্যব্যয়ে ওই জিনিসটিও পেটে চালান করে দেয় রোজী। এমনকি জানতেও চায়নি কেকটা খেলে তার কি উপকার হবে।

রোজী তার অনাগত সন্তানের জন্য নার্সারী রুম সাজাতে শুরু করেছে। সাদা এবং হলদে রঙের ওয়াল পেপার দিয়ে সারা দেয়াল মুড়ে দিয়েছে, নাদুস-নুদুস অনেক বাচ্চার পোস্টারও কিনেছে। অদিতি বা আদিত্যর জন্য গাদা গাদা খেলনা কিনছে রোজী এবং

সীমান্ত। রোজী ছোট ছোট নিমা তৈরি করেছে তার বাবুকে পরাবে বলে। রবার্ট এবং তাঁর স্ত্রীও অবশ্য প্রচুর জামা-কাপড়, খেলনা ইত্যাদি কিনে দিচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে এখন প্রায়ই আড্ডা দেয় রোজী। আরও দু'একজন প্রতিবেশী, যাদের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে, তারাও আসে।

রোজী পুলকিত হয়ে অনুভব করে তার পেটের ভেতর একটা জীবন্ত সত্তা নড়াচড়া করছে। বাচ্চাটা যে সাংঘাতিক দুষ্টু হবে সে ব্যাপারে ওর এবং সীমান্তর কোন সন্দেহ নেই। প্রায়ই সে তার মাকে লাথি মারে। মা তাকে চোখ রাঙায়, বলে, 'লাথি মারবি না, সোনা। তাহলে আমিও কিন্তু...'

রোজী প্রায়ই সীমান্তকে ডেকে মজার একটা দৃশ্য দেখায়। পরনের ম্যাক্সি বুকের কাছে গুটিয়ে সীমান্তকে বলে, 'আমার পেটের দিকে তাকিয়ে থাকো, একটা জিনিস দেখতে পাবে।'

সীমান্ত যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ দেখে রোজীর ফোলা পেটের একটা পাশ উঁচু হয়ে উঠল, পরক্ষণে ঢেউ খেলে ওটা চলে গেল আরেক ধারে।

খিলখিল করে হাসতে থাকে রোজী। বলে, 'দেখো, দেখো। বাবু আমার কি রকম দুষ্টুমি করছে।'

এর মধ্যে একদিন সীমান্ত কক্সবাজারে গেল শূটিং করতে। রোজীকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ডাক্তার নিষেধ করলেন। এই সময় লম্বা ভ্রমণ ঠিক হবে না।

সীমান্ত ঢাকার বাইরে যাবার দু'দিন পরে হঠাৎ জ্বরে পড়ল রোজী। উথালপাতাল জ্বর। পেটের বাচ্চার জন্য সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেল ও। আর এমনই ভাগ্য ওই সময় তার টেলিফোনটাও গেল নষ্ট হয়ে। ভাগ্যিস, ডি সুজারা ছিলেন। ওঁরা তাঁদের সাধ্যমত করলেন রোজীর জন্য। কক্সবাজারে, শৈবালে উঠেছিল সীমান্ত, সেখানে ফোন করলেন। খবর পেয়ে সাথে সাথে চলে এল সীমান্ত।

তবে ভয়ের কিছু ছিল না। ডাক্তার জানালেন ভাইরাস জ্বর। ঘরে ঘরে এখন সবার এই অসুখ। তবে জ্বরটা বেশ কাহিল করে দিল মেয়েটাকে। পরবর্তী পনেরো দিন আর ঘর ছেড়েই বেরুল না। নিজেকে নিয়ে সে এত ব্যস্ত ছিল যে অন্য দিকে তাকানোর ফুরসত মেলেনি। ফলে আলবার্ট ডেভিডের খবর সে নিতে পারল না। জানেও না তার ডেভিড আঙ্কেল 'কোমা'র মধ্যে থেকে মারা গেছেন। খবরটা জানতে পারল মৃত্যুর অন্তত দিন দশেক পরে।

সেদিন বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে রোজী, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। রিসিভার কানে ঠেকাতে একটি মহিলা কণ্ঠ ভেসে এল, 'রোজমেরী?'

'জ্বী। বলছি।'

'আমি সারাহ্ ডেভিড। আমার কথা মনে আছে?'

এক মুহূর্তের জন্য নামটা মনে করতে পারল না রোজী। হঠাৎ মনে পড়তে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'জ্বী। জ্বী। মনে পড়েছে।' এতদিন ডেভিড আঙ্কেলের খবর নেয়নি বলে নিজের ওপর খুব রাগ হলো ওর। সাগ্রহে জানতে চাইল, 'ডেভিড আঙ্কেলের এখন অবস্থা কেমন?'

ও প্রান্তের কণ্ঠস্বরটি নীরব হয়ে গেল। এক মুহূর্ত পরে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শুনল রোজী। 'ডেভিড মারা গেছে, রোজমেরী।'

'কি!' আর্তনাদ করে উঠল রোজী।

'গত সোমবার, বেলা তিনটার দিকে মারা গেছে আমার ভাই,' করুণ গলায় বললেন মহিলা। 'আমি আপনাকে খবর দেয়ার চেষ্টা করেছি। রিং হচ্ছিল। কিন্তু কেউ ধরেনি।'

'এতদিন আমাদের ফোনটা নষ্ট ছিল। গতকাল ঠিক হয়েছে। কিন্তু ডেভিড আঙ্কেল...' গলা বুজে এল রোজীর, ফোঁপাতে শুরু

করল।

'এখন কেঁদে আর কি হবে?' সান্ত্বনার সুরে বললেন সারাহ্। 'আমি আপনাকে ফোন করেছি একটা কাজে। ডেভিড আপনার জন্য একটা জিনিস রেখে গেছে। জিনিসটা কিভাবে পৌঁছাই বলুন তো?'

'কি জিনিস?'

'একটা বই। বারবার বলে গেছে অবশ্যই যেন আপনাকে বইটা দেই।'

'আপনিই বলুন কিভাবে যোগাযোগ করলে আপনার সুবিধে হয়?'

'আমি কাল সকালে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে যাব ডেভিডের ধার নেয়া বইগুলো ফেরত দিতে। আপনি আসতে পারবেন?'

'পারব। কিন্তু আপনাকে কি করে চিনব?'

'আমি লাইব্রেরীর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকব হাতে লাল একটা প্যাকেট নিয়ে।'

'ঠিক আছে। আমি আসব। ফোন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।'

কোন কথা না বলে সারাহ্ ফোন রেখে দিলেন।

ক্রাডলে রিসিভার রেখে চুপচাপ বসে রইল রোজী। ওর বুক ঠেলে কান্না আসছে। মানুষটা ওর কাছে বাবার মতই ছিলেন। সবসময় রোজীর সুবিধে-অসুবিধের দিকে লক্ষ রাখতেন। শূন্য ঠেকল বুকের মাঝখানটা। মস্ত একজন শুভানুধ্যায়ী হারিয়েছে ও। ডেভিডের কাঁচাপাকা চুলে বোঝাই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। পানিতে ভরে উঠল চোখ। কাঁদতে শুরু করল ও।

সবুজ তাঁতের শাড়ি পরা ভদ্রমহিলা। ফর্সা। সুশ্রী। বেশ লম্বা। দাঁড়িয়েছিলেন ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীর গেটের এক কোণে।

হাতে লাল রঙের একটা প্যাকেট। বোঝাই যায় কারও জন্য অপেক্ষা করছেন। দূর থেকেই রোজী বুঝে ফেলল চশমা পরা ওই ভদ্রমহিলাই সারাহ্ ডেভিড। সে গেট থেকে খানিকটা দূরে রিকশা থামাল। ভাড়া চুকিয়ে হেঁটে এল ভদ্রমহিলার কাছে। চোখাচোখি হতে হাতটা মাথার পাশে চলে গেল রোজীর অভিবাদনের ভঙ্গিতে, একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমি রোজমেরী। আপনি কি...'

'হ্যাঁ, আমিই সারাহ্,' সামান্য হাসলেন ভদ্রমহিলা। দেখলেন রোজীকে। বললেন, 'আপনার শরীর কেমন, ভাল?'

'আছি মোটামুটি। আপনি?'

এ কথার জবাব না দিয়ে হাতের প্যাকেটটা রোজীর দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। রোজী ওজন নিয়ে বুঝল বেশ ভারী বই। 'কিসের বই এটা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'প্রেতচর্চার ওপরে,' বললেন সারাহ্।

'প্রেতচর্চার বই?' ভুরু কোঁচকাল রোজী। 'বুঝতে পারলাম না আঙ্কেল আমাকে এই বই কেন দিয়েছেন।'

'আমি জানি না। ও যেদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ল সেদিন আপনার কথা বলছিল আমাকে। হাসপাতালে একবার জ্ঞান ফিরেছিল ওর। বারবার আমাকে এই বইটার কথা বলছিল যেন অবশ্যই আপনাকে এটা পৌঁছে দিই।'

'জ্ঞান ফিরেছিল আঙ্কেলের?'

'হ্যাঁ। প্রলাপ বকছিল। তারপর আবার জ্ঞান হারায় সে। সে জ্ঞান আর ফিরে আসেনি,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভদ্রমহিলা।

'ওঁর মেয়ে ডোরিসের খবর কি?'

'সে আবার জার্মানীতে চলে গেছে। আমিও সামনের শুক্রবার দিনাজপুরে যাচ্ছি।'

'আপনি দিনাজপুরে থাকেন?'

'হ্যাঁ। ওখানে একটা স্কুলে মাস্টারি করি। ডেভিড খুব করে বলেছিল আসতে। ওর সঙ্গে বহুদিন আমার দেখা নেই। কিন্তু এ দেখা যে শেষ দেখা হবে কে জানত!' চোখ ছলছল করে উঠল সারাহ্‌র।

রোজী কিছু বলল না। ওর আবার কান্না পেয়ে যাচ্ছে।

'আপনার ডেলিভারি ডেট কবে?' জিজ্ঞেস করলেন সারাহ্।

'অক্টোবরে।'

'প্রার্থনা করি সুস্থ থাকুন। ভাল থাকুন। এখন আমাকে যেতে হবে, ভাই।'

'আমাদের বাসায় একবার আসবেন না?'

'এবার নয়। আবার কখনও ঢাকা এলে যাব। আসি।'

তিনি হাত নেড়ে লাইব্রেরীতে ঢুকে গেলেন। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল রোজী। তারপর হাত নেড়ে একটা রিকশা ডেকে বলল, 'মনিপুরী পাড়া যাবে?'

ষোলো

রোজী আলবার্ট ডেভিডের দেয়া বইটি নিয়ে বসল দুপুরে, খাওয়া-দাওয়া সেরে। লাল প্যাকেট ছিঁড়তে বেরিয়ে এল কালো রঙের, শক্ত মলাটের একটি বই। ওপরে লেখা, 'যুগে যুগে প্রেত চর্চা।' লেখকের নাম *ধীরেন্দ্রনাথ রায়।* ১৯৫৫ সালের এডিশন। কলকাতার বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা দেব সাহিত্য কুটির বইটি বের করেছে।

হরর বই বা ফিল্মের প্রতি তেমন আগ্রহ নেই রোজমেরীর। হরর কথাটার মধ্যেই কেমন একটা ভীতিকর ভাব আছে। ডেভিড আঙ্কেল তাকে এ বই কেন দিলেন অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছিল ও, হঠাৎ চতুর্থ অধ্যায়ে চোখ আটকে গেল। ওখানে **'কলকাতায়ও প্রেত চর্চা!'** হেডিং-এর নিচে *'প্রেতসাধক ক্লেমেন্ট গোমেজের রহস্যময় অন্তর্ধান।'* কথাটি বড় বড় হেডিং-এ লেখা। আর ডেভিড আঙ্কেল ওই জায়গাটিতে লাল কালির চিহ্ন দিয়ে রেখেছেন। রোজীর ধাঁ করে মনে পড়ে গেল ক্লেমেন্ট গোমেজকে নিয়ে বলা ডেভিড আঙ্কেলের গল্পটা। সে আগ্রহ নিয়ে অধ্যায়টি পড়তে শুরু করল। ধীরেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন: উইচ ক্রাফট বা প্রেতচর্চার বিষয়টি প্রধানত চোদ্দশো থেকে সতেরোশো সাল পর্যন্ত ইউরোপের নানা দেশে গোপনে চর্চা হলেও এর রেশ আমেরিকা এবং এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ভারতে ডাকিনীবিদ্যা বা কাপালিকদের তন্ত্র-মন্ত্রের কথা খুব শোনা যায়। বিখ্যাত উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর ততোধিক বিখ্যাত উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'য় বর্ণিত কাপালিকদের কথা পাঠকদের কাছে স্রেফ কল্পনা মনে হলেও হিমালয়ের পাদদেশে এরকম কাপালিকদের সন্ধান সত্যি মিলেছে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে আজও সিদ্ধি লাভের নেশায় কালী মন্দিরে বালক-বালিকাদের উৎসর্গের কথা শোনা যায়। যদিও এ সম্পর্কে অকাট্য কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে খোদ কলকাতা শহরেই ক্লেমেন্ট গোমেজ নামে এক খ্রিস্টান ব্যবসায়ী যে প্রেত সাধনা করতেন তার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে। উল্লেখ্য, উনিশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপ ও আমেরিকায় ডাকিনীবিদ্যা সম্বন্ধে নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়, ফলে ডাকিনীবিদ্যা একটি সংগঠিত ধর্ম হিসেবে প্রচুর বিশ্বাসী লোককে আকৃষ্ট করে। এই লোকেরা নিয়মিতভাবে স্থানীয় কোভেনে (১৩ বা আরও কম সদস্যের দল) মিলিত হয়। আর

এরকম একটি কোভেন তৈরি করেছিল ক্লেমেন্ট গোমেজ যেখানে উইচ ক্রাফটে বিশ্বাসী লোকজনের নিয়মিত আনাগোনা ছিল। ক্লেমেন্ট গোমেজ বাস করত শহরতলিতে, লোকজনের ভিড় থেকে দূরে। কিন্তু তার প্রেত সাধনার কথা প্রকাশ হয়ে গেলে তার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। শোনা যায়, ক্লেমেন্ট গোমেজ নিজেকে 'শয়তানের চেলা' বলে ঘোষণা করেছিল। তার বাড়ি থেকে খানিক দূরের মাঠে, মাটি খুঁড়ে পুলিশ দু'টি শিশুর লাশও উদ্ধার করে। ওই সময় ওই এলাকায় শিশু হারানোর ব্যাপারটি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক একটি ঘটনা। শিশু নিখোঁজের ঘটনার সাথে প্রেত সাধক ক্লেমেন্ট গোমেজের সরাসরি সম্পৃক্ততার কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও হিন্দুপ্রধান ওই এলাকার লোকজন তার প্রতি অত্যন্ত নাখোশ হয়ে ওঠে। তাদের সন্দেহ ছিল, ক্লেমেন্ট গোমেজ শিশুদের হত্যা করে তার প্রেত সাধনা চালিয়ে যাচ্ছে। তার বাড়িতে যাদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল, এদের মাঝ থেকে দু'একজন হঠাৎ করেই, কোন কারণ ছাড়াই পাড়ার লোকদের হাতে প্রহৃত হতে শুরু করে। তার বিরুদ্ধে জনরোষ প্রবল হয়ে ওঠার আশঙ্কায় এক রাতে এক কাপড়ে ক্লেমেন্ট গোমেজ তার বালকপুত্রটিকে সাথে নিয়ে পালিয়ে যায়। তারপর তার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, ওই সময়, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পরপরই গোটা দেশ জুড়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। এই ডামাডোলের মাঝে ক্লেমেন্ট গোমেজ কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে তার খবরও কেউ রাখেনি। তার রহস্যময় অন্তর্ধান আজতক রহস্যই রয়ে গেছে। যদিও কেউ কেউ ধারণা করেন, ক্লেমেন্ট গোমেজ পূর্ব-পাকিস্তানে পালিয়ে গেছে।

প্রবন্ধটির নিচে একটি সাদা-কালো ছবি। এক মোটাসোটা মহিলা, দাড়িওয়ালা টাক মাথা এক প্রৌঢ়, তাদের মাঝখানে বসা ৯/১০ বছরের একটি ছেলে। ছবির ক্যাপশনে লেখা মিসেস ইভা

গোমেজ (সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত) একমাত্র সন্তান ক্লেমেন্ট জুনিয়র এবং ক্লেমেন্ট গোমেজ (সিনিয়র)।

আলবার্ট ডেভিড কি রোজীকে বইটি দিয়েছেন ক্লেমেন্ট গোমেজ সম্পর্কে জানার জন্য? বইটিতে ক্লেমেন্ট গোমেজের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে এরা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। গোমেজদের পিতামহের নিবাস ইংল্যান্ডে। তারা কলকাতায় অ্যালকোহলের ব্যবসা করত। কিন্তু এই ক্লেমেন্ট গোমেজই যে 'ড্রিম হাউজ'-এর সেই ক্লেমেন্ট গোমেজ তার প্রমাণ কি? প্রমাণ অবশ্য পেয়ে গেল রোজী পরের পাতা ওল্টাতেই।

পরের পাতায় আলবার্ট ডেভিড লাল কালি দিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছেন:

বইয়ের শেষ পাতায় দেখুন।

কৌতূহলী রোজী দ্রুত চলে গেল শেষ পাতায়। দেখল একটা ছবি সেঁটে রাখা হয়েছে। সম্ভবত অন্য কোন বই বা পত্রিকা থেকে ছবিটি ছিঁড়ে লাগানো হয়েছে। সাথে পিন-আপ করা একতাড়া কাগজ। তাড়াটার প্রথম পাতায় লেখা 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়?' রোজী পড়ল:

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেও অতি সুবিধাবাদী কেউ কেউ পাক-আর্মির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। এদের মধ্যে একজন ঢাকার মনিপুরী পাড়ার জনৈক ক্লেমেন্ট গোমেজ। তাকে সরাসরি রাজাকারী করতে কেউ দেখেনি। তবে ওই পাড়ার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মোবারক হোসেনের সাথে তার দোস্তী ছিল। অনেকেই পাক মেজর বা ক্যাপ্টেনদের দেখেছে গোমেজের বাড়িতে ঢুকে আড্ডা দিতে। জনশ্রুতি আছে, গোমেজ প্রেত সাধনা করত। তবে এর স্বপক্ষে সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গোমেজের একমাত্র ছেলে ক্লেমেন্ট গোমেজ জুনিয়র বিদেশে লেখাপড়া করত। '৬৯-এর পরে সে দেশে ফিরে আসে।

পাড়ার রাজাকারদের সঙ্গে তার সখ্য ছিল। পাড়ার এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের গদি লুট ও তাকে মারাত্মক ভাবে আহত করার অভিযোগ পাওয়া যায় তার বিরুদ্ধে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে তার পিতা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হবার পরে সে আবার বিদেশে চলে যায়। তারপর তার আর কোন হদিস মেলেনি।

এবার ছবিটির দিকে ভাল করে তাকাল রোজী। এ ছবিটিও সাদা-কালো। পাকিস্তানী এক মেজরের সাথে দেখা যাচ্ছে হাস্যোজ্জ্বল ক্লেমেন্ট গোমেজকে। তার টাকের পরিধি আরও বেড়েছে, মোটাও হয়েছে আগের চেয়ে। তবে '৪৭ সালের ছবির সাথে এই চেহারা বেশ মেলানো যাচ্ছে। তার ছেলের ছবি দেখে চমকে উঠল রোজী। চেনা চেনা লাগছে যেন! ইঁদুরের মত এমন সূচালো কান আর ঈগলের ঠোঁটের মত এমন খাড়া নাক কার যেন দেখেছে সে? বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে গেল চেহারাটা! রবার্ট ডি সুজা! যাহ্, তা কি করে হয়? উনি কেন ক্লেমেন্ট গোমেজের ছেলে হতে যাবেন? আচ্ছা, এই লোকের ঠোঁটের ওপর যদি হিটলারী একটা গোঁফ এঁকে দেয়া যায় এভাবে; আর থুতনিতে সাদা, ধবধবে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়?

আঁকা জোঁকায় এক সময় হাত ছিল রোজীর। দ্রুত হাতে স্কেচটা তৈরি করে ফেলল সে এবং স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকল ছবির দিকে।

যাদু মন্ত্র বলে যেন যুবক ক্লেমেন্ট গোমেজ প্রৌঢ় রবার্ট ডি সুজা হয়ে গেছে!

ঠিক এই সময় পেটের ভেতর প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল বাচ্চা। ব্যথায় ককিয়ে উঠল রোজী। নিজের চোখকে বিশ্বাস হতে চাইছে না। রবার্ট ডি সুজা তাহলে প্রেত সাধক ক্লেমেন্ট গোমেজের ছেলে? নাম ভাঁড়িয়ে আছেন? কিন্তু কেন? জবাবটা সাথে সাথে পেয়ে গেল রোজী। বাবার নৃশংস মৃত্যুর পরে ভয়ে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন

জুনিয়র ক্লেমেন্ট গোমেজ। কেউ যাতে তাঁকে '৭১-এর যুদ্ধাপরাধী বলে চিনতে না পারে সে জন্য রবার্ট ডি সুজা নাম নিয়ে দীর্ঘদিন পরে আবার দেশে ফিরেছেন। দাড়ি-গোঁফ দেখে এখন বোঝার উপায় নেই যে ইনি একসময় রাজাকার ছিলেন। এ লোক আবার গোপনে প্রেত সাধনা করছেন না তো?

রোজী দ্রুত আবার চতুর্থ অধ্যায়ে ফিরে গেল। এখানে লেখক বলছেন:

'প্রেত সাধক ক্লেমেন্ট গোমেজ সব সময় কালো পোশাক পরে থাকত। সে তার সতীর্থদের নিয়ে নির্জন ঘরে আরাধনা করত শয়তানের। ঘরে শুধু কালো রঙের মোমবাতি জ্বলত।'

রোজীর চট্ করে মনে পড়ে গেল মিসেস ডি সুজা ওকে লোডশেডিং-এর কারণে যে মোমদানি উপহার দিয়েছেন মোমবাতিসহ, সেগুলোর রঙ কালো।

রুদ্ধশ্বাসে রোজী পড়তে লাগল:

ক্লেমেন্ট গোমেজের মত প্রেতসাধকরা নিজেদেরকে ক্ষমতাশালী করে তোলার জন্য কব্জির রক্ত কেটে দিত। তবে ধারণা করা হয়, শয়তানের মত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবার জন্য প্রয়োজন কচি, নিষ্পাপ শিশু। আর সে শিশুকে হতে হবে সদ্যজাত, যাকে এখনও ব্যাপ্টাইজড্ বা পবিত্র করা হয়নি।

এই পর্যন্ত পড়েছে রোজী, এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠল। বইটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, পিপহোলে চোখ রেখে দেখল কে এসেছে, তারপর দরজা খুলল।

হাসিমুখে ভেতরে ঢুকল সীমান্ত। হাতে টকটকে গোলাপ।

'হাই সুইটি!' দয়িতার দিকে গোলাপগুলো এগিয়ে দিল সীমান্ত। কোন কথা না বলে ফুলগুলো নিল রোজী।

কপালে ভাঁজ পড়ল সীমান্তর। 'কি হয়েছে তোমার?'

'বলছি। বসো।' ওকে হাত ধরে একটা সোফায় বসিয়ে দিল

রোজী। বলল, 'তুমি জানো রবার্ট ডি সুজা আসলে কে?'

চোখ পিটপিট করল সীমান্ত। 'রবার্ট ডি সুজা তো রবার্ট ডি সুজাই।'

'উনি ক্লেমেন্ট গোমেজের ছেলে,' বলল রোজী। 'সেই ক্লেমেন্ট গোমেজ যে প্রেত সাধনা করত। যাকে স্বাধীনতার সময় মুক্তিযোদ্ধারা হত্যা করেছে। তার ছেলে রবার্ট। তবে রবার্ট তাঁর ছদ্মনাম। তাঁর আসল নাম ক্লেমেন্ট গোমেজ জুনিয়র।'

'কে বলল তোমাকে এ কথা?'

'ডেভিড আঙ্কেল আমাকে এই বইটা দিয়েছেন,' কালো মলাটের বইটা দেখাল রোজী সীমান্তকে। 'এরমধ্যে সব লেখা আছে। এই যে ছবি দেখো।'

ছবি দেখল সীমান্ত। তবে চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। বলল, 'তুমি একটা স্কেচ করেছ। তার সাথে রবার্ট আঙ্কেলের চেহারা মিলে যাবার ব্যাপারটা নেহায়েত কাকতালীয় ঘটনা ছাড়া অন্য কিছু নয়।'

'এখানে ওঁর থাকাটাও কাকতালীয় বলতে চাও? এই বাড়িতে, যেখানে ক্লেমেন্ট গোমেজ জুনিয়র বড় হয়েছে?' মাথা নাড়ল রোজী। 'দু'জনের বয়স সম্পূর্ণ মিলে যায়। রবার্ট আঙ্কেল বলেছিলেন তিনি দেশ বিভাগের পরে বাংলাদেশে মানে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে আসেন। তখন তার বয়স ছিল নয় অথবা দশ। মূল ছবিটা দেখো। '৭১-এ তিনি কেমন দেখতে ছিলেন। আর স্কেচ আঁকার পরে কেমন লাগছে। বর্তমানে ওঁর বয়স তো ষাটের ওপর। এর মাঝে কোন কাকতালীয় ব্যাপার নেই।'

'ঠিক আছে। বুঝলাম আমাদের রবার্ট আঙ্কেলই ক্লেমেন্ট গোমেজ জুনিয়র, প্রেত সাধক পিতার সন্তান। তাতে কি হয়েছে?'

রোজী স্বামীর দিকে অস্বস্তি নিয়ে তাকাল। 'তাতে অনেক কিছুই হয়। তোমার কি মনে হয় না এই লোক তাঁর বাপের মতই?'

'মানে?' হাসল সীমান্ত। 'তুমি নিশ্চই বলতে চাইছ না যে রবার্ট

ডি সুজাও প্রেত সাধনা করেন?'

'যে লোক যৌবনে রাজাকারী করেছে সে প্রেত সাধনাও করতে পারে।'

'রবার্ট আঙ্কেল রাজাকার ছিলেন?' অবাক হলো সীমান্ত।

'এটা পড়ে দেখো,' পিন-আপ করা কাগজের তাড়াটির দিকে ইঙ্গিত করল রোজী। '৭১-এ রাজাকারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে-ছিলেন তোমার রবার্ট আঙ্কেল।'

লেখাটা পড়ল সীমান্ত হাসান। তার চেহারায় ফুটে উঠল বিস্ময়ের ভাব। সবশেষে বলল, 'এখানে লিখেছে '৭১-এ লুঠপাটের অভিযোগ আছে ক্লেমেন্ট গোমেজের ছেলের বিরুদ্ধে। কিন্তু সরাসরি তাকে অভিযুক্ত করা হয়নি। তা ছাড়া তার বাপও যে রাজাকার ছিল এমন প্রমাণও কিন্তু মেলে না বইতে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জান বাঁচানোর তাগিদে পাকিস্তানীদের সাথে অমন একটু-আধটু সম্পর্ক অনেকেই করেছে।'

'তুমি স্বাধীনতা বিরোধীদের পক্ষে কথা বলছ!'

'তা বলছি না। তুমি একজন নিরীহ মানুষকে খামোকা প্রেত সাধক বানিয়ে দিতে চাইছ তার প্রতিবাদ করছি।'

'বাপ যেমন ছেলে তো তার মতই হবে।' বলল রোজী। 'ক্লেমেন্ট গোমেজ জুনিয়র রাজাকার না হলে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল কেন, বলো?'

'এ তো খুব সহজ কথা। রাজাকার সন্দেহে বাপকে মুক্তিযোদ্ধারা মেরে ফেলেছে। হয়তো ছেলে ভেবেছিল এরপর সে টার্গেট হবে। তাই পালিয়েছে।'

'এবং সময় সুযোগ মত নাম ভাঁড়িয়ে আবার দেশে ফিরে এসেছে, তাই না?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রোজী। 'তারপর প্রাক্তন পৈতৃক বাড়িতে গোপনে প্রেত চর্চা শুরু করে দিয়েছে। রবার্ট ডি সুজা নির্ঘাত এখানে কোভেন তৈরি করেছেন।'

'কোভেন কি?'

'প্রেত চর্চাকারীদের দলের নাম কোভেন। এগুলোর বিভিন্ন নাম আছে। একেক দলে তেরোজন করে সদস্য থাকে। আমেরিকা-ইউরোপে এরকম অনেক কোভেন আছে যেখানে সবাই মিলে প্রেতচর্চা করছে। এই বইতে সব লেখা আছে। রবার্ট তাঁর স্ত্রী, রানু অধিকারী সহ অন্যান্য আরও যারা ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী আছেন, তাদের নিয়ে এই বাড়িতে দল গঠন করেছেন। প্রেত সাধকের দল!'

'কি যা-তা বলছ!' বিরক্ত হলো সীমান্ত।

'মোটেই যা-তা বলছি না,' বলল রোজী। কালো মলাটের বইটির একটা পৃষ্ঠা খুলে আঙুল দিয়ে দেখাল। 'দেখো, এখানে কি লিখেছে। লিখেছে তারা প্রেতচর্চার সময় রক্ত ব্যবহার করে। তাদের বিশ্বাস রক্তের আছে অনেক ক্ষমতা। আর সে রক্ত যদি হয় সদ্যজাত কোন শিশুর, তাহলে তারা শয়তান প্রদত্ত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে শিশুর শরীরের মাংসও তারা ব্যবহার করে থাকে।'

'এসব ছাই-পাঁশ পড়ে আসলে তোমার মাথাই খারাপ হয়ে গেছে,' রীতিমত ওকে ধমক দিয়ে বসল সীমান্ত।

ধমকে দমল না রোজী। উল্টো তেড়েফুঁড়ে জানতে চাইল, 'রবার্টরা আমাদের সঙ্গে এত ভাব করেন কেন?'

'কারণ ওঁরা খুব মিশুক এবং আন্তরিক স্বভাবের মানুষ। তোমার কি ধারণা ওঁরা ম্যানিয়াক?'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ, ওঁরা ম্যানিয়াক। ওরা ব্ল্যাক ম্যাজিকে বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস করেন ম্যাজিক তাঁদের ক্ষমতা দিতে পারে। এঁরা প্রেতচর্চা করেন কারণ এঁরা অসুস্থ এবং উন্মাদ!'

'রোজমেরী!'

'মিসেস ডি সুজা আমাকে যে কালো মোমগুলো দিয়েছেন ওগুলো আসলে প্রেত পূজার মোম। ডেভিড আঙ্কেল ঠিকই সন্দেহ

করেছিলেন।'

'ওরকম কালো মোম ঢাকা শহরের প্রায় সব ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে খুঁজলেই তুমি পেয়ে যাবে। কালো, সবুজ, নীল, লাল হরেক রঙের মোম। তার মানে এই নয় যে, রবার্ট দম্পতি প্রেত সাধনা করেন। রবার্ট সাহেবের বাবা ভাল মানুষ ছিলেন না মানি; তাই বলে আঙ্কেলকেও তুমি প্রেত সাধক বলে সার্টিফিকেট দিয়ে দিতে পারো না। ওরা তোমার জন্য অনেক করেছেন, ভুলে যাচ্ছ কেন?'

'আমি কিছুই ভুলে যাইনি। তবে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমার বেবীর ধারে-কাছেও কাউকে আসতে দেব না। দরকার হলে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। তবু ওদের সংস্পর্শে আর যাচ্ছি না। ডেভিড আঙ্কেল ঠিকই বলেছিলেন এ বাড়িতে আমাদের আসা উচিত হয়নি।' দু'হাতে বইটা চেপে ধরে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল রোজী। মৃদু কাঁপছে ও উত্তেজনায়।

সীমান্ত ওকে চুপচাপ লক্ষ করল কয়েক মুহূর্ত, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ডা. মোস্তাফিজুর রহমান সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? তিনিও এই দলে নেই তো?'

মুখ ঘোরাল রোজী, তাকাল স্বামীর দিকে। সীমান্ত বলে চলল, 'অনেক উন্মাদ ডাক্তারও তো আছে যারা এসব উদ্ভট কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস করে, তাই না? কে জানে, ডাক্তারও পেছন থেকে কলকাঠি কিছু নাড়ছেন কিনা।'

আবার জানালার দিকে দৃষ্টি ফেরাল রোজী, চেহারায় শান্ত, সমাহিত একটি ভাব ফুটে উঠেছে। 'না, আমার মনে হয় না উনি এসবের সাথে জড়িত।' বলল সে, 'মোস্তাফিজ সাহেব বুদ্ধিমান এবং বিবেচক।'

'তা ছাড়া তিনি খ্রিস্টান নন, মুসলিম,' হাসল সীমান্ত। 'যাক, জেনে নিশ্চিন্ত হলাম অন্তত একজন তোমার সন্দেহের তালিকা

থেকে বাদ পড়েছে।'

'আমি বলছি না যে সবাই প্রেত সাধনা করে,' বলল রোজী। 'তবে প্রত্যেকেরই বিশেষ একটা ধর্ম বিশ্বাস থাকে। কেউ শুভ'র বন্দনা করে, কেউ আবার অশুভ'র পূজা করে। রবার্ট দম্পতি নিশ্চই দ্বিতীয় দলে পড়েন। আর আমি আমার সন্তানের নিরাপত্তার জন্য কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নই। আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।'

'তুমি কোথাও যাচ্ছ না,' বলল সীমান্ত।

'অবশ্যই যাব,' আবার থমথমে হয়ে উঠল রোজীর চেহারা।

'তোমার এখন মাথা গরম হয়ে আছে,' হেসে পরিবেশ হালকা করতে চাইল সীমান্ত। 'যাও, মাথায় ঠাণ্ডা পানি দিয়ে এসো। আর দাও, বইটা আমাকে দাও।' হাত বাড়াল সে।

'আমার এখনও পড়া শেষ হয়নি,' বলল রোজী।

'পরে পড়বে। এখন দাও তো। রেখে দিই।'

'সীমান্ত—'

'উঁহু, আর কথা নয়। এটা পড়ে মাথা গোলমাল হয়ে গেছে তোমার। এত উত্তেজিত হয়ে পড়লে বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে। তা জানো?' রোজীর হাত থেকে এক রকম কেড়েই নিল সীমান্ত বইটা। বুক শেলফের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একেবারে ওপরের তাকে, যেখানে রোজী নাগাল পাবে না, দুটো বাঁধাই করা শারদীয় দেশের মাঝখানে প্রেতচর্চার বইটা ঢুকিয়ে রাখল।

'দরকার হলে কাল আবার পড়ো,' স্ত্রীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'এখন চুপচাপ শুয়ে থাকো কিছুক্ষণ। আমাকে বলো আমার মাথা গরম। তোমারটা কি কম?'

সতেরো

ডা. মোস্তাফিজুর রহমানকে বিমূঢ় দেখাল। 'ইন্টারেস্টিং!' বললেন তিনি। 'রবার্ট ডি সুজার বাবা তাহলে প্রেতসাধনা করতেন? কিন্তু রবার্ট আমাকে বলেছিলেন তার বাবা ফিল্ম প্রডিউসার ছিলেন। ষাটের দশকে দু'একটা ছবি প্রযোজনা করেছিলেন। কিন্তু ছবিগুলো ফ্লপ যাবার কারণে ওদিকে নাকি আর পা বাড়াননি।'

'আর আমাদেরকে বলেছেন তাঁর বাবার প্রেস ছিল,' বলল রোজী।

এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'সন্দেহ নেই, আসল সত্য তিনি চেপে গেছেন লজ্জায়। তবে বাজি ধরে বলতে পারি, রবার্ট ওসব তন্ত্র-মন্ত্রে মোটেই বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীকে এমন একটা সন্দেহ করার কারণে আপনি যে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাও পরিষ্কার বুঝতে পারছি।'

'রবার্ট সাহেব বা তার স্ত্রীর আর ছায়াও মাড়াতে চাই না আমি,' বলল রোজী। 'হতে পারে একটু বেশি কর্কশ হয়ে উঠছি আমি, কিন্তু আমার সন্তানের সামান্যতম ক্ষতি হতে পারে তেমন কোন ঝুঁকির মধ্যে আমি কিছুতেই যাব না।'

'তা তো অবশ্যই,' সায় দিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। 'কোন মা-ই সে কাজ করবে না।'

সামনের দিকে ঝুঁকে এল রোজী, 'মিসেস ডি সুজা তাঁর নিদ্রিক্ষার রস বা সাদা কেকে ক্ষতিকর কিছু মেশাতে পারেন বলে

মনে হয় আপনার?'

হেসে উঠলেন ডাক্তার। 'মিসেস হাসান, মিনির মত স্নেহময়ী নারী আমি আর দু'টি দেখিনি। আপনার সন্তানকে নিয়ে যিনি সারাক্ষণ এত টেনশনে থাকেন তাকেই সন্দেহ করছেন··· না, ক্ষতিকর কিছু মেশাননি তিনি আপনার পানীয় বা কেকে। ভুলে যাচ্ছেন কেন, জিনিসটা আমার নির্দেশেই তৈরি হয়েছে। তাছাড়া ওতে ক্ষতিকর কিছু থাকলে অনেক আগেই তার প্রমাণ পেয়ে যেতাম আমি আপনার বা বাচ্চার মাঝে।'

'আমি মিসেস ডি সুজাকে বলে দিয়েছি শরীর ভাল লাগছে না আমার। আর ওসব খাব না।'

'সম্ভবত খেতেও হবে না,' বললেন মোস্তাফিজুর রহমান। 'আমি আপনাকে কিছু ট্যাবলেট লিখে দিচ্ছি। আপনার ডেলিভারির সময়ও তো কাছিয়ে এসেছে। নিদ্রিক্ষার বদলে ট্যাবলেটগুলো খেলেই চলবে। মিনি বা মি. সুজাকেও আর কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়বে না।'

'মানে?'

'মানে ওরা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছেন,' বললেন ডাক্তার। 'খুব শীঘ্রি। রবার্টের শরীর তেমন ভাল যাচ্ছে না বোধহয় জানেন। তাঁর ভেতরে মৃত্যুভয় ঢুকে গেছে প্রবল ভাবে। উনি ধারণা করে বসে আছেন আর দু'মাসও টিকবেন না। সে জন্য শেষবারের মত ইন্ডিয়া ঘুরে আসতে চাইছেন। জানেনই তো, রবার্টের জন্ম ভারতে। পরশু রাতে উনি আমাকে জানালেন কথাটা। মাদ্রাজেও যাবেন একবার। শরীর চেক-আপ করে আসবেন। সাথে তাঁর স্ত্রীও যাচ্ছেন।'

'তাই নাকি?' বলল রোজমেরী। 'কই আমি জানি না তো!'

'সঙ্কোচে হয়তো বলতে পারেননি। আপনাকে ওঁরা নিজেদের মেয়ের মত ভালবাসেন। আপনার এখন ক্রাইসিস পিরিয়ড চলছে।

এমন সময় আপনাকে একা ফেলে যেতে হচ্ছে। আমাকে ওঁরা বলেছিলেন, 'জানি না, রোজমেরী ব্যাপারটা কিভাবে নেকে। মাইন্ড করে বসে কিনা!'

'না না। আমি কেন মাইন্ড করতে যাব। ওঁরা যাচ্ছেন চিকিৎসার জন্য। আমার এতে মাইন্ড করার কিছু নেই।'

'তবে খুশি হয়েছেন নিশ্চই?' হাসলেন ডাক্তার। 'অবশ্য মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচারই কথা। ওঁরা আগামী রোববার চলে যাচ্ছেন। তবে একটা অনুরোধ—রবার্টকে বলার দরকার নেই আপনি তাঁর আসল পরিচয় জেনে গেছেন। শুনলে বেচারা খুব কষ্ট পাবেন। আর তিন/চার দিনের ব্যাপার তো!'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল রোজী, তারপর বলল, 'আপনি শিওর ওঁরা রোববার চলে যাচ্ছেন?'

'ওঁরা তো তাই বললেন,' জবাব দিলেন ডাক্তার।

'ঠিক আছে,' বলল রোজী। 'আপনার অনুরোধ রাখব আমি। রবার্ট দম্পতিকে আমার অনুভূতির কথা জানতে দেব না। তবে রোববার পর্যন্তই।'

'সে আপনার মর্জি,' বললেন মোস্তাফিজুর রহমান। 'আমি কাল সকালে ট্যাবলেটগুলো পাঠিয়ে দেব। আর মিনি তাঁর রুটি পিঠা এবং নিদ্রিক্ষার রস নিয়ে এলে রেখে দেবেন পরে খাওয়ার কথা বলে। পরে ওগুলো ফেলে দিয়ে ট্যাবলেট খেয়ে নেবেন।'

'তা হলে খুবই ভাল হয়,' বলল রোজী, 'আমার আর কোন দুশ্চিন্তা থাকে না।'

'বর্তমান স্টেজে আপনাকে দুশ্চিন্তামুক্ত রাখাই সবচেয়ে দরকার,' বললেন ডা. মোস্তাফিজুর রহমান।

রোজী হাসল। 'যদি আমাদের ছেলে হয়,' বলল সে, 'তাহলে ওর নাম মোস্তাফিজ আদিত্যও রাখতে পারি।'

জবাবে হাসলেন শুধু ডাক্তার, কিছু বললেন না।

*

ওইদিন সন্ধ্যায় রবার্ট এবং মিনি দু'জনেই বেড়াতে এলেন রোজমেরীর ফ্ল্যাটে। কুশল বিনিময়ের পরে রবার্ট বললেন, 'একটা খবর দিতে এলাম তোমাকে, মা। আমরা আগামী রোববার কলকাতা যাচ্ছি। ওখান থেকে মাদ্রাজে যাব শরীর চেকআপ করতে।'

রোজী বলল, 'খবরটা আমি আজ সকালেই পেয়েছি মোস্তাফিজ সাহেবের কাছ থেকে।'

মিসেস ডি সুজা বললেন, 'তোমার বাচ্চা হবার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু তোমার আঙ্কেলের শরীরটা দ্রুত চেকআপ না করালেই নয়। এখানকার ডাক্তারদের ওপরে ভরসা করতে পারলাম না বলেই...'

'না না। ঠিক আছে,' বলল রোজী। 'আমার কোন সমস্যা হবে না।'

'তোমাকে আমরা চিঠি দেব,' বললেন রবার্ট। 'কার্ডও পাঠাব।'

'কবে নাগাদ ফিরবেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল সীমান্ত।

'বলতে পারছি না ঠিক,' বললেন রবার্ট। 'আমার একটা টিউমার অপারেশনের কথা আছে। অপারেশনটা যদি জরুরী হয়ে পড়ে তাহলে কিছুদিন দেরি তো হবেই।'

'আচ্ছা, যান,' বলল রোজী। 'ভালয় ভালয় ফিরে আসুন।'

শনিবার রাতে রবার্টদের সম্মানে তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রানু অধিকারী ছোটখাট একটি পার্টি দিলেন। রোজী এবং সীমান্ত সেই পার্টিতে গেল। এলেন মোস্তাফিজুর রহমান, পাঁচতলার সেই দুই বোন, চিত্র প্রযোজক সিদ্দিকী, স্টিফেন গনজালেস সহ আরও কয়েকজন। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু গিফট নিয়ে গেল ওঁদের দু'জনের জন্য।

পরদিন সকালে, বিদায় নেয়ার আগে, মিসেস ডি সুজা

রোজীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমরা যেখানেই থাকি না কেন সব সময় তোমার কথা মনে পড়বে আমাদের।'

মি. ডি সুজা আদর করে চুমু খেলেন রোজীর কপালে। বললেন, 'মা, ভাল থেকো। তোমার এবং তোমার সন্তানের জন্য আমাদের আশীর্বাদ থাকবে সব সময়।'

'চিঠি লিখতে ভুলবেন না যেন,' বলল রোজী। 'আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।'

সীমান্ত জোর করে রবার্ট ডি সুজার সুটকেসটা নিয়ে লিফটে ঢুকল। ওঁদের বিদায় জানাতে রোজী সহ আরও অনেকে নিচে নেমে এল।

স্কুটারে চড়ে ডি সুজা দম্পতি যখন এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হয়েছেন, রোজী টের পেল ওঁদের যাত্রায় মোটেই উল্লসিত হতে পারছে না সে। বরং মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

অলস বিকেলটা কাটানোর জন্য রোজী 'যুগে যুগে প্রেত চর্চা' বইটি পড়বে ভেবেছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় বইটি খুঁজে পেল না সে। সীমান্তকে বই-এর কথা জিজ্ঞেস করল ও।

'সরি, ডার্লিং,' বলল সীমান্ত। 'ওটা আমি ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছি। আমি চাইনি ওসব ছাই-পাঁশ পড়ে তুমি আপসেট হয়ে পড়ো।'

রেগে গেল রোজী। 'তুমি এমন কাজ কিছুতেই করতে পারো না। ডেভিড আঙ্কেল বইটা আমাকে গিফট দিয়েছিলেন!'

'আমি অতশত ভেবে দেখিনি,' ভুল স্বীকার করল সীমান্ত। 'বইটা পড়ে তুমি আবার উত্তেজিত হয়ে যেতে পারো ভেবে কাজটা করেছি। আবারও বলছি, সরি!'

'কাজটা তুমি মোটেই ঠিক করোনি,' চরম বিরক্তি প্রকাশ পেল রোজীর কণ্ঠে, 'ওটা গিফটের বই হোক বা না হোক তাতে কিছু

আসে যায় না। তোমার কোন অধিকার নেই একজনের বই এভাবে ফেলে দেয়ার। আমি ভালমত পড়তে পর্যন্ত পারলাম না!'

'মাফ চাই, রোজ,' হাতজোড় করল সীমান্ত। 'আমি বুঝিনি তুমি এত মাইন্ড করবে।'

সীমান্তর নির্বুদ্ধিতা রোজীকে এত বেশি ক্ষুব্ধ করে তুলল যে রাগে স্বামীর সঙ্গে সে রাতে কথাই বলল না। ভুরু কুঁচকে, ছাদের দিকে চেয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকল বিছানায়। সন্তানের কথা ভাবছে। উদ্বিগ্ন বোধ করছে। উদ্বেগের কারণ জানা নেই ওর। আর মাত্র দিন পনেরো বাকি ডেলিভারির। রোজী শুনেছে এ সময় সব মা'ই অজানা সব কারণে টেনশনে থাকে। অনেকের ঘুমও হয় না। কোলবালিশটা টেনে চোখ বুজল ও। ঘুমাতে চেষ্টা করল।

হঠাৎ একটা শব্দ শুনল রোজী রবার্ট ডি সুজাদের ফ্ল্যাট থেকে। কেউ যেন একটা চেয়ার টেনে নিল। হতে পারে আওয়াজটা ওপরের ফ্ল্যাট থেকে এসেছে। রাতের বেলা এমন অদ্ভুত শব্দ কত শোনা যায়! বিশেষ করে এয়ারকুলার চলার সময়।

ডি সুজারা এখন কোলকাতায়। গল্প করছেন বা ঘুমাচ্ছেন। ওঁদের কথা ভেবে কি লাভ রোজীর। সে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে দিল।

পেটের ভেতরে জীবন্ত সত্তাটা এই সময় জেগে উঠল, নড়াচড়া শুরু করে দিল।

আঠারো

বাচ্চাদের কিছু ডায়াপার, ট্যালকম পাউডার এবং বেবী লোশন কেনার জন্য রোজী এসেছিল গ্রীন সুপার মার্কেটে। সেই সাথে কয়েকটা খামও কিনতে হবে। গত পরশু মি. এবং মিসেস ডি সুজার চিঠি এবং কার্ড এসেছে ভারত থেকে। তাঁরা এখন মাদ্রাজে। লিখেছেন: তোমাদের দু'জনের কথা সব সময় মনে পড়ছে। এখানকার আবহাওয়া বেশ ভাল, চমৎকার। আর আমরা ভালমতই পৌঁছেছি। দু'একদিনের মধ্যে ভেলোর হাসপাতালে যাব তোমাদের আঙ্কেলের চেক-আপের জন্য।

রোজীর ডেলিভারি ডেট আর হপ্তাখানেক পরে। তার সারাটা দিন এখন অনাগত সন্তানের চিন্তায় কেটে যায়। সীমান্ত এখন বিকেল পাঁচটার পরে আর বাইরে থাকে না। সঙ্গ দেয় স্ত্রীকে। রোজীর টুকটাক জিনিসপত্র কিনে আনে বাড়ি ফেরার পথে। ডায়াপার এবং ট্যালকম পাউডারের কথা সীমান্তকে বললে সে-ই নিয়ে আসত। কিন্তু রোজীর টানা বাড়িতে বসে থাকতে থাকতে হাঁপ ধরে গিয়েছিল। আর বাসা থেকে গ্রীন মার্কেট তো খুবই কাছে। তাই সে ইচ্ছে করে চলে এসেছে। না এলেই বোধহয় ভাল করত। তা হলে আর রফিকুল ইসলামের সঙ্গে দেখা হত না এবং পরবর্তী ঘটনাগুলোও ঘটত না।

রফিকুল ইসলাম ঢাকা থিয়েটারে কাজ করে। রোজীদের রায়ের বাজারের বাসায় দু'একবার গেছে ও। সে 'সাথী

ডিপার্টমেন্টাল স্টোর'-এ ঢুকেছিল বাচ্চার জন্য সেরেল্যাক কিনতে। রোজীকে দেখে খুশি ও অবাক হলো। বলল, 'অনেক দেরিতে আপনার খবর জেনেছি, ভাবী। সীমান্ত ভাই তো এখন মস্ত স্টার। মঞ্চে খুব একটা সময় দিতে পারেন না। গত দু'মাস ধরে তো তাঁর কোন পাত্তাই নেই!'

রোজী হাসল। 'হ্যাঁ, ও খুব ব্যস্ত। আমার সাথেও কথা বলার সময় পায় না। ভাল কথা, আমার কাছে আপনার একটা ধন্যবাদ পাওনা রয়ে গেছে।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ। টিকিট জোগাড় করে না দিলে ওই সময় হয়তো আমাদের "টাইটানিক" দেখাই হত না।'

' "টাইটানিক"-এর টিকিট?' অবাক হলো রফিকুল ইসলাম।

'এরই মধ্যে ভুলে বসে আছেন দেখছি! গত জুনে আপনি সীমান্তকে দুটো টিকিট দিয়েছিলেন। তখন "টাইটানিক" রমরম করে চলছিল মধুমিতায়, টিকিট পাওয়া যাচ্ছিল না!'

'আমি সীমান্ত ভাইকে "টাইটানিক"-এর কোন টিকিট দেইনি। আমি নিজেই তো ছবিটা দেখতে পারিনি।'

'ধ্যাত্, আপনার দেখছি সত্যি খুব ভুলো মন।'

'সত্যি বলছি, ভাবী। আমি সীমান্ত ভাইকে "টাইটানিক" দূরে থাক, কোন ফিল্মের টিকিটই দেইনি।'

'কিন্তু ও যে বলল আপনি দিয়েছেন,' বলল রোজী।

'উনি ভুল বলেছেন,' হাসল রফিকুল ইসলাম।

ব্যাপারটা অদ্ভুত। রফিকুল ইসলাম চলে যাওয়ার পরে ভাবল রোজী। সে রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। 'আনন্দ' সিনেমা হল-এর পেছনের সংবাদপত্রের স্টল থেকে লেটেস্ট সংখ্যা 'সানন্দা' এবং 'সাপ্তাহিক ২০০০' কিনবে।

সীমান্ত টাইটানিকের দুটো টিকিট ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে

বলেছিল, রফিকুল ইসলাম দিয়েছে। ওই সময় 'টাইটানিক' জ্বরে ঢাকা কাঁপছে। দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল টিকিট। সীমান্ত বলেছিল রফিকুল ইসলামের চাচা নাকি মধুমিতার ম্যানেজার। তাই সুলভ মূল্যে ডিসির টিকিট দুটো জোগাড় করতে পেরেছে সে। সীমান্ত ছবি দেখতে যায়নি তার জরুরী কাজ ছিল বলে। বান্ধবী সোমাকে নিয়ে 'টাইটানিক' দেখে এসেছিল রোজী ইভনিং শোতে।

সাবধানে রাস্তা পার হলো রোজী ট্রাফিক সিগন্যালে লাল বাতি জ্বলে উঠতে।

রফিকুল ইসলামকে ধন্যবাদ জানাবে ঠিক করেছিল রোজী ছবিটি দেখে এসে। পরে নানা কাজে ভুলে গেছে। কিন্তু এখন রফিকুল ইসলাম বলছে সে এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। তাহলে কি সীমান্ত ইচ্ছে করে ওকে মিথ্যা কথা বলেছে? নিজেই টিকিট জোগাড় করে রফিকুল ইসলামের নাম বলেছে। কিন্তু কেন?

মস্ত পেটটা নিয়ে ফুটপাথ ধরে সাবধানে হাঁটছে রোজী। ওর পিঠ ব্যথা করছে। আজ বেশ গরম পড়েছে। কপালের ঘাম মুছল সে রুমাল দিয়ে।

বিশেষ কোন কারণে সীমান্ত চায়নি সে রাতে রোজী বাড়িতে থাকুক? কিন্তু কেন চাইবে? ওর কি কোন পুরানো গার্লফ্রেন্ড আসার কথা ছিল সেদিন? রোজীর মনে পড়ে গেল, ছবি দেখে বাড়ি ফিরে দেখেছিল সীমান্ত তার শার্ট ধুচ্ছে বাথরুমে বসে। জিজ্ঞেস করলে বলেছিল শার্টটা পরে পরদিন বেরুবে তাই ধুয়ে রাখছে।

আচ্ছা, শার্টে কি কোন মেয়েলী পারফিউম লেগেছিল যা ধুয়ে ফেলতে ব্যস্ত ছিল সীমান্ত? উঁহু, তা নয়। বাথরুম থেকে কোন পারফিউমের গন্ধ পায়নি রোজী। নিদ্রিক্ষারিষ্টের গন্ধ পেয়েছিল। আর সে রাতে দানব হয়ে উঠেছিল সীমান্ত। ঘুমের মধ্যে চড়াও হয়েছিল ওর ওপরে। রোজী বেডরুমেও নিদ্রিক্ষার গা গোলানো গন্ধ

পেয়েছিল। সে রাতে অনেকক্ষণ জেগে ছিল ও। রবার্টদের ঘর থেকে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল অস্পষ্ট। ভেসে এসেছিল বাঁশির সুর।

না, কেউ বাঁশি বাজাচ্ছিল না, রিটায়ার্ড ডেন্টিস্ট ডা. রোজারিও ডি কস্টার টেপ রেকর্ডার বাজছিল। উনি মাঝে মাঝে রেকর্ডারে বাঁশির সুর শোনেন। সীমান্তই তাকে প্রথম এ তথ্যটা দেয়। সে কি করে জানল? নিশ্চই রবার্টদের শলাপরামর্শের মধ্যে ছিল। বিদ্যুৎ চমকের মত রোজীর মনে পড়ে যায়, রবার্টদের লিভিংরুমের মেঝেতে সে কি সব চক্র ইত্যাদি আঁকা দেখেছে। সারা ঘর জুড়েই। সীমান্ত বলেছিল ওটা নাকি এক ধরনের ডিজাইন। প্রেত সাধনার ডিজাইন নয়তো? 'পিশাচ দ্বীপ' নামে মাসুদ রানার একটা বইতে এ ধরনের ডিজাইনের বর্ণনা পড়েছিল রোজী বহুদিন আগে। ডেভিড আঙ্কেলের দেয়া বইটিতেও এরকম নকশার কথা আছে। একটি অধ্যায়ে লেখা ছিল, শয়তানের সাগরেদ হতে হলে আগে 'ব্রত পূজা' নামে এক ধরনের পূজা করতে হয়। শয়তানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে আগ্রহী যে কেউ এই পূজায় অংশ নিতে পারে। কোভেন বা দলে অল্প সংখ্যক সদস্য থাকে। শয়তানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে হয় তাদেরকে, শরীরে গেঁথে দেয়া হয় বিশেষ কোন চিহ্ন যা 'শয়তানের চিহ্ন' বলে পরিচিত। এও কি সম্ভব সীমান্ত ওদের কোভেনে যোগ দিয়েছে? সীমান্ত এখন ওদেরই একজন? তার শরীরের কোথাও শয়তানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার গোপন চিহ্ন রয়ে গেছে?

কথাটা বিশ্বাস করতে মন চাইল না রোজীর। সে চল্লিশ টাকা দিয়ে 'সানন্দা' আর '২০০০' কিনল। ভাবল, আজ খুব গরম পড়েছে। আজ ওর বাসা থেকে বেরুনো উচিত হয়নি।

সংবাদপত্রের স্টলের বিপরীত দিকে, রাস্তার ওপাশে একটা ফল-ফলারীর দোকান। বাসায় কলা নেই। সকালে কলা ছাড়া নাস্তা

করতে পারে না সীমান্ত। রোজী ফলের দোকানটার দিকে পা বাড়াল। আবার মাথার ভেতর সীমান্তকে নিয়ে জেগে উঠল দুশ্চিন্তাটা।

সীমান্ত'র বাঁ কাঁধে একটা আঁচিল আছে। যেন জমাট বাঁধা রক্ত। আঁচিলটা কি এখনও আছে?

জানে না রোজী। কারণ খালি গায়ে সীমান্ত আজকাল আর ঘুমোয় না। অথচ গরমের সময় চিরকাল ওর উদোম হয়ে শোয়া অভ্যাস। এখন ড্রেসিং গাউন পরে ঘুমায়। সীমান্তকে শেষ কবে নগ্ন অবস্থায় দেখেছে রোজী?

একটা টেম্পু বিকট শব্দে হর্ন দিল, চমকে উঠল ও। রাস্তা পার হচ্ছিল। আরেকটু হলেই চাপা পড়তে যাচ্ছিল। পেছন থেকে একজন বলে উঠল, 'দেইখা শুইনা হাঁটেন, আপা।'

কিন্তু সীমান্ত কেন? ওর কেন প্রেত-পূজারীদের দলে যোগ দেয়ার প্রয়োজন পড়বে? ওর ক্যারিয়ার এখন ধা ধা করে ওপরে উঠছে, প্রচণ্ড ব্যস্ত সে; সামনের মাসে লেটেস্ট মডেলের গাড়ি কেনার চিন্তা-ভাবনা করছে। ওর কি দরকার একদল বুড়ো-বুড়ির উদ্ভট কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার?

জবাবটা হঠাৎ পেয়ে গেল রোজী।

মনে পড়ে গেছে শোভন রহমানের অন্ধত্বের কথা। এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটিও কি বিশ্বাস করতে হবে ওকে?

না, ও বিশ্বাস করতে চায় না।

কিন্তু ঘটনাটাকে অস্বীকার করেই বা কিভাবে?

যেদিন শোভন রহমানের অন্ধ হয়ে যাবার ঘটনাটা শুনল সীমান্ত, মনে পড়ে যায় রোজীর, সেদিন সকালে তাকে কেমন যেন অস্থির লাগছিল। ও নিশ্চই খবরটা পাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল।

দু'য়ে দু'য়ে চার এবার মিলে যেতে লাগল সহজেই।

শোভন রহমান অন্ধ হয়ে গেল, বহুজাতিক কোম্পানির বিজ্ঞাপন চিত্রটির অফার পেয়ে গেল সীমান্ত। ওই একটি বিজ্ঞাপন চিত্র ওর সামনে খুলে দিল অমিত সম্ভাবনার দ্বার। তারপর শুরু হয়ে গেল সীমান্ত হাসানের উত্থান পর্ব। একেবারে জোয়ারের মত।

শোভন রহমান যদি অন্ধ না হ'ত তাহলে সীমান্ত ওই কাজটি পেত না। কাজ হাসিল করার জন্য (হয়তো) সীমান্ত প্রেত সাধকদের কোভেনে (হয়তো) যোগ দিয়েছে।

কোথায় যেন রোজী পড়েছিল, যারা ডাকিনী বিদ্যা বা প্রেত চর্চায় বিশ্বাস করে তারা মনে করে ডাইনীরা নানা ভাবে লোকের ক্ষতি করতে পারে। তারা আবৃত্তি করে যাদুর মন্ত্র। সেই মন্ত্র তার শিকারকে আক্রান্ত করে। কোভেনের সদস্যদের দলগত মানসিক শক্তি মানুষকে অন্ধ বানিয়ে দিতে পারে, বোবা করতে পারে, পারে চলৎশক্তিহীন করে দিতে। এমনকি শিকারকে মেরে ফেলার ক্ষমতাও তারা রাখে।

চলৎশক্তিহীন করে হত্যা!

'ডেভিড আঙ্কেল?' অজান্তে চেঁচিয়ে ওঠে রোজী। একটা বাচ্চা মেয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল, ওর দিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকাল, হাত চেপে ধরল তার মা'র।

আলবার্ট ডেভিড 'যুগে যুগে প্রেত চর্চা' বইটি সে রাতে পড়ছিলেন। ফোন করেছিলেন তিনি রোজীকে পরদিন দেখা করার জন্য। বলতে চেয়েছিলেন রবার্ট ডি সুজা প্রেত-পূজারী ক্লেমেন্ট গোমেজের ছেলে। সীমান্ত জানত রোজী ডেভিড আঙ্কেলের সাথে দেখা করতে যাবে। সে বাইরে চলে গিয়েছিল—কেন যেন? ওহ্, আইসক্রীম কিনতে। তারপর রবার্টদের কলিংবেল বাজিয়েছিল। জানতে গিয়েছিল ওদের জন্য আইসক্রীম আনবে কিনা? নাকি শলা-পরামর্শ করতে গিয়েছিল? তারপর সম্মিলিত মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে...' কিন্তু ওরা বুঝল কি করে ডেভিড রোজীকে কি বলতে

চাইছেন? রোজী না জানলেও ওরা ঠিকই ধারণা করতে পেরেছিল।

আলবার্ট ডেভিড নিদ্রিক্ষারিষ্টের কথা শুনে চমকে উঠেছিলেন কেন? তিনি ওকে বারবার কবচটা পরতে নিষেধ করেছিলেন। 'শয়তানের ছত্রাক' বলে একটা শব্দ তিনি আন্ডারলাইন করে গেছেন বইতে। রবার্টকে বলেছিলেন 'ট্যানিস রুট' বলে কোন ভেষজের কথা তিনি শোনেননি। এনসাইক্লোপিডিয়া ঘাঁটার কথা বলেছিলেন ডেভিড আঙ্কেল। তাহলে জানাজানি হয়ে যেত, 'ট্যানিস রুট' আসলে 'শয়তানের ছত্রাক' জাতীয় কিছু? কাজেই রবার্ট ডি সুজা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর দলের সদস্য সীমান্তও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল গোপন সত্য প্রকাশ হয়ে যেতে পারে ভেবে। আর তারপরই সে ডেভিড আঙ্কেলের গ্লাভস চুরি করে। চুরি করে কারণ, নিত্য ব্যবহার্য কোন জিনিস ছাড়া শিকারের ক্ষতি করা সম্ভব নয়।

এতক্ষণে মনে পড়ে গেছে রোজীর লেখাটার কথা। বছর পাঁচেক আগে 'রহস্যপত্রিকা'য় ডাকিনী চর্চার ওপরে একটা লেখা পড়েছিল সে। তখন বেশ 'রহস্যপত্রিকা' পড়ত রোজী। ওখানে লেখক বলেছিলেন, ডাকিনী চর্চা বা প্রেত চর্চায় প্রেত সাধকরা নির্দিষ্ট লোকের মূর্তি তৈরি করে মোম বা কাঠ দিয়ে এবং ওই লোকের কিছু জিনিস যেমন নখ, ক্লিপ বা চুল মূর্তির শরীরে রাখে। তারপর আগুনে পুড়িয়ে, কেটে বা পিন ফুটিয়ে মূর্তিটাকে ধ্বংস করে। ডাইনীর ভিক্টিম বা সেই নির্দিষ্ট লোকটি ওই রকমই কষ্ট পায়, এমনকি মরেও যেতে পারে।

রোজী জানে না, ওরা আলবার্ট ডেভিডের মোমের মূর্তি তৈরি করেছিল কিনা। তবে সীমান্ত যে গ্লাভস চুরি করেছে সে ব্যাপারে ওর কোন সন্দেহ থাকল না। ডেভিড যেদিন ওর বাসায় বেড়াতে এসেছিলেন সেদিন কারেন্ট ছিল না। সীমান্ত ঘরে ঢোকার আগে

হয়তো রবার্টদের সাথে দেখা করেছিল। রবার্ট ওকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, 'এই ডেভিড লোকটা "ট্যানিস রুট" নিয়ে সন্দেহ প্রবণ হয়ে উঠেছে। যাও, ঘরে গিয়ে ওর পরনের কিছু একটা জিনিস হাতিয়ে নিয়ে এসো।' আর সীমান্ত তাই করেছে।

'বাণ' মারার গল্প ছেলেবেলায় মা'র কাছে অনেক শুনেছে রোজী। ডেভিড আঙ্কেলও মাঝে মাঝে এ নিয়ে নানা গল্প বলতেন। কিন্তু এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি রোজী সঙ্গত কারণেই। কাজেই এসবে বিশ্বাস করারও অবকাশ ছিল না। কিন্তু এখন ওর বিশ্বাস হচ্ছে। আতঙ্কে বুক হিম হয়ে আসছে, ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কারণ এখন ও বুঝতে পেরেছে সীমান্ত কেন এসব কাজ করেছে। জানে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য, সাফল্যের জন্য সীমান্ত ওদেরকে বিনিময়ে কি দিতে চাইছে।

ওর সন্তান। প্রেত সাধকদের প্রেত পূজার জন্য উৎসর্গ করবে আপন রক্তের সন্তানকে।

বাবা হবার তেমন কোন ইচ্ছেই ছিল না সীমান্ত হাসানের শোভন রহমান অন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত। পেটের ভেতর বাচ্চাটার নড়াচড়া দেখতে চাইত না সে, স্পর্শ করতে আগ্রহ ছিল না কখনও, ব্যস্ততার অজুহাতে সব সময় দূরে দূরে থাকত।

কারণ সীমান্ত খুব ভাল করেই জানত ওদের হাতে বাচ্চাটাকে তুলে দেয়ার পরে ওরা ওকে নিয়ে কি করবে বলে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে।

উদ্‌ভ্রান্তের মত নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এল রোজী। মনকে প্রবোধ দিচ্ছে সে যা ভাবছে আসলে তা সব ভুল। আর মাত্র সাতদিন বাকি আছে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার। উল্টোপাল্টা কতগুলো ঘটনার মধ্যে খামোকা সম্পর্ক জুড়ে দিয়ে তুমি স্রেফ পাগলামি শুরু করে দিয়েছ, নিজেকে প্রবোধ দিল ও। ডাইনী-টাইনী বা তন্ত্র-মন্ত্র সব মিছে কথা। ডেভিড আঙ্কেলের মৃত্যু অস্বাভাবিক ছিল না, যদিও

ডাক্তাররা মৃত্যুর সঠিক কারণ উদ্ঘাটন করতে পারেননি। শোভন রহমানের অন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিও একই রকম। তাছাড়া সীমান্ত যাদু দিয়ে কি করে অন্ধ করে দেবে যদি তার কাছে শোভন রহমানের ব্যক্তিগত কোন জিনিস না থাকে। কাজেই বোকা মেয়ে, মাথা ঠাণ্ডা করো। এত উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই।

আচ্ছা, যদি তাই হয় তাহলে সীমান্ত টিকিটের ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলল কেন?

এ প্রশ্নেরও জবাব পেয়ে গেল রোজী শাওয়ারের ঠাণ্ডা পানিতে ভিজতে ভিজতে। সীমান্ত কালে-ভদ্রে ঢাকা ক্লাবে যায় জুয়ো খেলতে। ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ নয় ওর। এখন রোজীর সন্দেহ নেই, সে রাতে সীমান্ত ঢাকা ক্লাবেই গিয়েছিল তার চেপে রাখা নেশাটা আবার চাগিয়ে উঠতে। বউর কাছে ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিল ভয়ে। জানতে পারলে রোজী যদি দক্ষযজ্ঞ বাঁধিয়ে দেয়!

আচ্ছা, তা না হয় হলো। কিন্তু সীমান্ত বেশ কিছুদিন নগ্ন হয়ে ঘুমাচ্ছে না কেন? হতে পারে কাঁধের আঁচিলটার বংশবৃদ্ধি ঘটেছে। তাই সীমান্ত বিব্রত বোধ করেছে খালি গায়ে ঘুমাতে। আলবার্ট ডেভিডের গলায় অনেক কালো আঁচিল লক্ষ করেছে রোজী। ভদ্রলোক তাঁর আঁচিলগুলো নিয়ে খুব বিব্রত ছিলেন। পারতপক্ষে পাঞ্জাবী পরতেন না আঁচিল দেখা যাবে বলে।

নগ্ন না হয়ে শোবার ব্যাখ্যাও পাওয়া গেল। তবুও রোজীর মাথায় কুট কুট করছে একের পর এক প্রশ্ন। সীমান্ত কেন ডেভিডের বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে? কেন ডি সুজাদের বাড়িতে সে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাত? কিসের এত কথা ওদের সঙ্গে? সে শোভন রহমানের অন্ধ হবার খবর শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল কেন? কেন সীমান্ত ঘরে আসার পরে সে রাতে ডেভিড আঙ্কেলের হাত মোজা হারিয়ে গিয়েছিল?

চুল আঁচড়াল রোজী। তারপর জামা-কাপড় পরে ঢুকল কিচেনে। ঢকঢক করে দু'গ্লাস ঠাণ্ডা দুধ গিলল।

না, এসব প্রশ্নের জবাব জানা নেই রোজীর। জানে না ওর মাথাটা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে কিনা। জানে না ওর একান্ত আপনজন সীমান্ত হাসান সত্যি ওর প্রেমিক স্বামী নাকি ইতিমধ্যে তার এবং বাচ্চাটার শত্রুতে পরিণত হয়েছে।

ঘড়ির দিকে তাকাল রোজী। প্রায় চারটা বাজে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবে সীমান্ত।

ফিল্ম ম্যাগাজিন 'তারকা বিশ্ব'-র গত ঈদ সংখ্যায় টিভি এবং ফিল্মের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বাসার ফোন নম্বর দিয়ে দিয়েছিল। সংখ্যাটা খুঁজে বের করল রোজী। তারপর শোভন রহমানের নাম্বারটা টুকে তার বাসায় ফোন করল।

প্রথমবার রিং হতেই ওপাশ থেকে ধমকের সুরে জানতে চাইল একজন, 'হ্যালো?'

'শোভন রহমানকে একটু চাইছি আমি…'

'বলছি।'

'আমি ফ্লোরা রোজমেরী হাসান,' বলল রোজমেরী। 'সীমান্ত হাসানের স্ত্রী।'

'আচ্ছা!'

'আপনি কেমন আছেন জানতে ফোন করেছি।'

হাসল শোভন রহমান। 'ভাল আছি! বেশ ভাল আছি, মিসেস হাসান! এই তো আজ সকালেও গোটা দুই গ্লাস ভেঙে ফেললাম পানি খেতে গিয়ে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে গতকাল বিকেলে পা পিছলে মচকে গেছে গোড়ালি। মাথার ভেতরটা সবসময় দপ্ দপ্ করে ব্যথায়। আরও জানতে চান, মিসেস রোজমেরী?'

আন্তরিক দুঃখিত গলায় রোজী বলল, 'আপনার দুর্ঘটনার কারণে

সীমান্ত বড় ধরনের ব্রেক পেয়েছে এ নিয়ে কিন্তু আমরা দু'জনের কেউই সুখী নই।'

শোভন রহমান চুপ করে রইল এক মুহূর্ত, তারপর বলল, 'এই তো দুনিয়ার রীতি। কেউ উঠবে কেউ পড়বে। কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ। যাকগে, এ নিয়ে এখন আর আফসোস করি না। আপনার স্বামীর যোগ্যতা ছিল সে উঠে গেছে। আমাকে ভাগ্য সহায়তা করেনি তাই সবার করুণার পাত্র হয়ে এখন বেঁচে থাকতে হচ্ছে।'

'সীমান্ত আমাকে বলেছিল আপনাকে দেখতে যেতে,' বলল রোজী। 'আমি খুবই দুঃখিত যে সময়ের অভাবে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।'

'না, ঠিক আছে। শুনলাম আপনি মা হতে চলেছেন?'

'জ্বী। আগামী হপ্তায় ডেলিভারি ডেট।'

'অভিনন্দন রইল আপনার জন্য। তা সীমান্ত আছে কেমন? ও তো এখন খবর-টবরও নেয় না। সেই কবে ঢাকা ক্লাবে শেষবার দেখা হলো! আমরা পোকারস খেললাম। বাজিতে হেরে গেলাম আমি।'

'ঢাকা ক্লাবে সীমান্তর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আপনার?' গলার স্বর কেঁপে উঠল রোজীর। 'কবে?'

'আমি অন্ধ হয়ে যাবার আগের দিন সম্ভবত। বুধ বা বৃহস্পতিবার হবে হয়তো। কেন, সীমান্ত বলেনি আপনাকে কিছু? ও তো আমাকে জুয়োতে হারিয়ে দিতে পারলে সবাইকে বলে বেড়াত।'

'না, বলেনি,' হাঁপিয়ে উঠল রোজী। 'আচ্ছা, একটা কথা—ঢাকা ক্লাবে আপনারা যেদিন বাজি ধরলেন, সীমান্ত কি আপনার কাছ থেকে কিছু চেয়ে নিয়েছিল বা আপনি কিছু হারিয়েছিলেন?'

'মানে?'

'মানে আপনি প্রতিদিন ব্যবহার করেন এমন কিছু জিনিস...'

'নাহ্, মনে পড়ছে না।'

'একটু মনে করে দেখুন না।'

'ও হ্যাঁ। মনে পড়েছে। আমার লাল রঙের টাইটা চেয়ে নিয়েছিল সীমান্ত। ওরটা আমাকে দিয়েছিল। বলেছিল আমার টাইটা নাকি ওর খুব পছন্দ হয়েছে। কেন, কি হয়েছে? ও ওর টাই ফেরত চাইছে? চাইলে নিয়ে যেতে পারে। আমার এখন আর এসবের প্রতি কোন আগ্রহ নেই।'

'না, টাই ফেরত চায়নি সীমান্ত,' দম বন্ধ করে বলল রোজী। 'ওর হাতে নতুন টাই দেখে অবাক হয়েছিলাম সেদিন। জিজ্ঞেস করেছিলাম কার জিনিস। জবাবে কিছু না বলে শুধু হেসেছিল সীমান্ত।'

'স্রেফ ফাজলামি করে সেদিন টাই বদল করি আমরা। কিন্তু আপনি এমন ভাবে বললেন যেন সীমান্ত চুরি করেছে আমার টাই।'

'আচ্ছা, এখন রাখি,' বলল রোজী। 'আমি শুধু আপনার কুশল জানতে ফোন করেছিলাম।'

'অবস্থার কোন উন্নতি নেই। যা হোক, খবর নেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কেউ তো এখন খবরও নেয় না আমার। যেন বাতিল মাল একটা।'

আর কোন কথা না বলে ফোন নামিয়ে রাখল রোজী।

চারটা বেজে দশ।

সীমান্তর ফিরে আসার সময় ঘনিয়ে আসছে দ্রুত।

বাথরুমে গিয়ে ঢুকল রোজী। একটানে গলা থেকে নিদ্রিক্ষারিষ্টের চেনটা খুলে ফেলল, ছুঁড়ে মারল কমোডের মধ্যে। ফ্লাশের চেন টেনে দিল। পানির তীব্র আলোড়নের মধ্যে তলিয়ে গেল তিনশো বছরের পুরানো কবচ।

বেডরুমে ঢুকে তোষকের তলা থেকে একশো আর পঞ্চাশ টাকার খুচরো একটা বান্ডিল বের করল রোজী। বিপদের সময় কাজে লাগতে পারে ভেবে রেখে দিয়েছিল সীমান্ত। টেলিফোন ইনডেক্সটা ঢোকাল হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে, ভিটামিন ক্যাপসুলের ছোট্ট শিশিসহ। তারপর সুটকেস গোছাতে শুরু করল দ্রুত হাতে। পেটের ভেতর বাচ্চাটা এমন সময় ঘাঁই মারল। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করল রোজী। কয়েকটা শাড়ি, ম্যাক্সি, বেবী লোশন, ডায়াপার ইত্যাদি নিয়ে সুটকেসের ডালা বন্ধ করে দিল ও। তারপর হলওয়ে ঘুরে বেরিয়ে এল ফ্ল্যাটের বাইরে।

ভাড়াটেরা যে লিফট ব্যবহার করে সেদিকে পা বাড়িয়েছিল রোজী, খানিক এগিয়ে আবার ফিরে এল। উঠল সার্ভিস এলিভেটরে। ফ্ল্যাটের নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীরা এটা ব্যবহার করে।

লিফটে চড়ে নেমে এল রোজী রাস্তায়। মোড় ঘুরে উঠে এল বিজয় সরণীর রাস্তায়। তারপর একটা রিকশা ভাড়া করল। মগবাজার যাবে।

মিস হেলেন, ডা. মোস্তাফিজুর রহমানের রিসেপশনিস্ট, রোজীকে সুটকেসসহ দেখে হাসল, 'আপনার লেবার পেইন আশা করি ওঠেনি?'

'না,' বলল রোজী, 'তবে ডাক্তার সাহেবের সাথে দেখা করতে এসেছি। খুব জরুরী।'

ঘড়ির দিকে তাকাল হেলেন। 'উনি এখন রোগী দেখছেন।' বলল সে, 'পাঁচটার আগে অফিস থেকে বেরুবেন না।' মধ্য বয়স্ক এক লোকের দিকে ইঙ্গিত করল। 'উনি মকবুল সাহেব। আমাদের ডাক্তার সাহেবের পি. এ। আপনি বসুন। স্যার ফ্রী হলে আপনাকে মকবুল ভাই জানাবেন।'

মকবুল একটা বই পড়ছিল, তার দিকে রোজী তাকালে সে

সামান্য মাথা ঝাঁকাল।

রোজী রিসেপশন রুমের লাল প্লাস্টিকের একটা চেয়ার দখল করে বসে পড়ল, সুটকেসটা রাখল পায়ের কাছে। হ্যান্ডব্যাগ খুলে টিস্যু বের করে হাতের তালু আর কপালের ঘাম মুছল।

'বাইরে গরম কেমন?' জিজ্ঞেস করল হেলেন।

'সাংঘাতিক,' জবাব দিল রোজী। 'রাস্তায় তো চলাই যায় না। দিন দিন তাপমাত্রা যেন বেড়েই চলেছে।'

পঞ্চাশের কোঠায় বয়স, এক মহিলা বের হয়ে এল ডা. মোস্তাফিজুর রহমানের চেম্বার থেকে। মহিলাকে এর আগেও ডাক্তারের অফিসে দেখেছে রোজমেরী। রোজীকে দেখে মহিলাও চিনতে পারল। হেসে বলল, 'খবর কবে?'

'আগামী মঙ্গলবার।' বলল ও।

'গুড লাক,' বলল মহিলা। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল হেলেনকে নিয়ে।

মোস্তাফিজুর রহমানের ব্যক্তিগত সহকারী গিয়ে ঢুকল তার বসের অফিসে। মহিলা হেলেনের সাথে খানিক বক্‌বক্‌ করে রোজীকে হাত নেড়ে বিদায় হলো। রোজী করার কিছু না পেয়ে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একটা 'টাইম' পত্রিকার পাতা ওল্টাতে লাগল।

'মাফ করবেন, ম্যাডাম,' ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল হেলেন। 'আপনি কি সেন্ট মেখে এসেছেন?'

'কেন?' মুখ তুলে চাইল রোজী।

'না, মানে সেন্টের গন্ধটা আমারও খুব পরিচিত কিনা।' নাক টানল মেয়েটা।

নাক টানল রোজীও। বাতাসে নিদ্রিস্কারিষ্টের গন্ধ! বুঝতে পারল কবচটা ফেলে দিলেও গন্ধটা ওকে ছাড়েনি।

'আমি কোন সেন্ট ব্যবহার করি না,' বলে বইয়ের পাতায় চোখ

ফেরাল সে।

'কিন্তু গন্ধটা আমাদের সাহেব যে সেন্ট ব্যবহার করেন অবিকল তার মত।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রোজীর। 'আপনাদের সাহেব মানে?'

'ডাক্তার সাহেবের কথা বলছি। উনি মাঝে মাঝে একটা সেন্ট মেখে আসেন গায়ে। মাগো, কি বিকট গন্ধ! তখন তাঁর পাঁচ হাতের মধ্যে যায় কার সাধ্য। খেয়াল করেননি কখনও?'

'না,' বলল রোজী।

'তাহলে আপনার হয়তো ওঁর সেন্ট মেখে আসার সময়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পড়েনি। মাঝে মাঝে ভাবি, গিয়ে বলি, স্যার, কি সব ছাই ভস্ম মেখে আসেন। গন্ধে টিকতে পারি না। আর সেন্টের নামেরও যা ছিরি! কি সব নিদ্রিক্ষা-ফিদ্রিক্ষা...'

'টাইম' সাময়িকীটা টেবিলের ওপর রেখে সুটকেসটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রোজী। 'আমার স্বামী বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।' বলল সে। 'ওকে একটা কথা বলে এক মিনিটের মধ্যে আসছি।'

'সুটকেসটা রেখে যেতে পারেন। খামোকা বোঝা বইবেন কেন?' বলল বাচাল মেয়েটা।

তার কথায় কান দিল না রোজী। সুটকেস নিয়েই বের হয়ে এল রিসেপশন রুম থেকে।

উনিশ

ডা. মোস্তাফিজুর রহমানের চেম্বার থেকে গজ দশেক দূরে একটা টেলিফোন বুদ আছে। কাঁচে মোড়া কার্ডফোনের ঘরটাতে ঢুকল রোজী। ইনডেক্স খুলে শায়লা বেগমের নাম্বার বের করল। তারপর ফোন করল ঢাকা মেডিকেলে।

শায়লা বেগম নয়, এক পুরুষ কণ্ঠ জানতে চাইল, 'কাকে চাই?'

'শায়লা আপা আছেন? আমি ওঁর এক পুরানো পেশেন্ট। দয়া করে শায়লা আপাকে একটু ডেকে দিন না! খুব দরকার।'

লোকটি বলল, 'এখন ডেকে দেয়া যাবে না। উনি এক্ষুণি একটা জরুরী অপারেশনে ঢুকবেন।'

'প্লীজ! প্লীজ!' আকুতি জানাল রোজী। 'আমার খুব বিপদ। একটা মিনিট শুধু কথা বলব শায়লা আপার সাথে। আমাকে একটু দয়া করুন!'

ও পাশের লোকটি চুপ হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড পরে জিজ্ঞেস করল, 'কি নাম বলব?'

'বলুন ফ্লোরা রোজমেরী হাসান। গত জানুয়ারিতে ওঁর সাথে আমার প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়।'

'আচ্ছা, দেখি, কি করা যায়। লাইনে থাকুন,' বলে লোকটা রিসিভার নামিয়ে 'শবনম আপা! শবনম আপা!' বলে কাকে যেন ডাকতে লাগল।

রোজী কানে রিসিভার ঠেকিয়ে রাখল। বুদের ভেতরে

সাংঘাতিক গরম লাগছে। ঘেমে প্রায় গোসল করে ফেলেছে ও। পেটের ভেতরে লাথি মারল বাচ্চাটা, মোচড় খেল। তাড়াতাড়ি, শায়লা আপা! মনে মনে বলল রোজী। আমাকে বাঁচান।

ওরা সবাই প্রেত সাধক। সবাই মিলে একজোট হয়েছে। সীমান্ত, ডা. মোস্তাফিজুর রহমান, মি. এবং মিসেস ডি সুজা। ওকে এত আদর যত্ন করার মানে এখন বুঝতে পারছে রোজমেরী। ওরা ওর বাচ্চাটাকে চায়। রোজী সন্তান জন্ম দেবে, তারপর ওরা ওকে—ভয় পাসনে সোনা, সান্ত্বনা দিচ্ছে রোজী, আমার অদিতি, আমার আদিত্য! কোন ভয় নেই। ওরা তোর চুলও স্পর্শ করতে পারবে না। তার আগে সব ক'টাকে খুন করব।

'হ্যালো,' একটা নারী কণ্ঠ ভেসে এল। লাফিয়ে উঠল রোজী। 'শায়লা আপা?'

'না। আমি শবনম পারভীন। শায়লা আপার অ্যাসিস্ট্যান্ট। আপনি রোজমেরী হাসান?'

'জ্বী, জ্বী।'

'শায়লা আপার পেশেন্ট?'

'জ্বী। গত এগারো জানুয়ারি ওঁর সাথে আমার প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়।'

'ওঁর সাথে দরকারটা কি বলুন তো?' জানতে চাইল শবনম পারভীন। 'আসলে শায়লা আপা এই মুহূর্তে খুব ব্যস্ত। আমাকে বললে...'

'ক্ষমা করবেন, ম্যাডাম। আমার শায়লা আপার সাথেই কথা বলা দরকার। প্লীজ, ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলুন আমার জীবন-মরণ সমস্যা। ওঁর সাথে কথা বলতে না পারলে মস্ত বিপদে পড়ে যাব,' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল রোজী। 'প্লীজ!'

'আচ্ছা, লাইনে থাকুন। আমি ডেকে দিচ্ছি।'

মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ও। হাতের চেটো দিয়ে কপালের

ঘাম মুছল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে পাথরের মত জমে গেল। ইস! মোস্তাফিজুর রহমানের চেম্বারের এত কাছে থেকে ফোন করা মোটেই উচিত হয়নি তার। এখান থেকে ডাক্তারের 'মোস্তাফিজ ক্লিনিক'-এর সাইনবোর্ড স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ডাক্তার যদি চেম্বার থেকে বের হয়ে কয়েক পা সামনে হাঁটেন তাহলেই তিনি পরিষ্কার দেখতে পাবেন ওকে। আর ইতিমধ্যে সীমান্তও হয়তো বাসায় চলে এসেছে। সে ঘরে ফিরে দেখবে রোজী নেই, সুটকেসও নেই। হয়তো ভাববে রোজী মোস্তাফিজ সাহেবের ওখানে গেছে। তখন ফোন করবে সে মোস্তাফিজ ক্লিনিকে। তারপর দু'জনে মিলে খুঁজতে বেরুবে ওকে। সেই সাথে অন্যরাও। রানু অধিকারী, ফ্লোরেন্স—

'হ্যালো?' আবার নারী কণ্ঠ।

কণ্ঠটা চিনতে পেরে পুলক জাগল শরীরে। 'শায়লা আপা?'

'জ্বী। আপনি রোজমেরী হাসান? আমি তো ভেবেছিলাম আপনি ঢাকার বাইরে চলে গেছেন।'

'না, আপা। কোথাও যাইনি,' বলল রোজী। 'আমি আরেক ডাক্তার দেখিয়েছি। দেখাতে চাইনি। জোর করে আমার কয়েকজন প্রতিবেশী কাজটা করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু ওই ডাক্তারটা ভাল না, শায়লা আপা। সে আমার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে, অদ্ভুত সব ড্রিঙ্ক আর ক্যাপসুল খেতে দিয়েছে। আপনি বলেছিলেন অক্টোবরের দশ তারিখে আমার ডেলিভারি ডেট। আমি চাই আপনি আমার ডেলিভারি করান। আপনি যত টাকা চাইবেন আমি দেব, শায়লা আপা।'

'কিন্তু, মিসেস হাসান, আজ মাত্র চার তারিখ। এখনই—'

'আমি তার আগেই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যেতে চাই,' ব্যাকুল গলায় বলল রোজী। 'আমার পক্ষে বাসায় থাকা এ মুহূর্তে কিছুতেই সম্ভব নয়। টেলিফোনে সব কথা বলাও সম্ভব নয়। যেখান থেকে

ফোন করছি সেখানে বেশিক্ষণ কথা বলা যাবে না। বিপদ হতে পারে। বিশ্বাস করুন, আমি খুবই বিপদের মধ্যে আছি। আমার স্বামী, ওই ডাক্তারসহ বেশ কিছু লোক আমার এবং আমার সন্তানের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। শায়লা আপা, আপনি হয়তো ভাবছেন আমি প্রলাপ বকছি। বিশ্বাস করুন আমার কথা একবিন্দু মিথ্যা নয়।'

'কিসের ষড়যন্ত্র?'

'ফোনে অত কথা বলা যাবে না,' গলার স্বর দ্রুত হয়ে উঠল রোজীর। 'মুখোমুখি বলতে হবে।'

'ঠিক আছে। কাল আমার অফিসে আসুন—'

'না, এখন,' বলল রোজী। 'আমি এক্ষুণি আসতে চাই। ওরা হয়তো ইতিমধ্যে আমার খোঁজ লাগিয়ে দিয়েছে।'

'মিসেস হাসান,' বললেন শায়লা বেগম, 'এখনই আমাকে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকতে হবে জরুরী একটা অপারেশনে। আপনি বরং কাল সকালেই আসুন—'

'প্লীজ! প্লীজ!' আর্তনাদ করে উঠল রোজী। 'একটু দয়া করুন।'

অপর পক্ষ চুপ করে রইল।

রোজী বলল, 'আমি আপনার অফিসে এসে সব ব্যাখ্যা করব। আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না, প্লীজ!'

'আমি রাত আটটার দিকে চেম্বারে যাব,' বললেন শায়লা বেগম। 'তখন আসতে পারবেন?'

'অবশ্যই পারব,' বলল রোজী। 'অনেক ধন্যবাদ, শায়লা আপা। তবে একটা কথা—'

'বলুন?'

'আমার স্বামী আপনার কাছে ফোন করতে পারে, দয়া করে তাকে আমার কথা বলবেন না।'

'ঠিক আছে বলব না।'

'আমি ঠিক আটটায় পৌঁছে যাব আপনার ক্লিনিকে।'

'আচ্ছা, আসুন।' বলে লাইন কেটে দিলেন শায়লা বেগম।

রোজী ফোন বুদ থেকে বের হয়ে আসছে, এমন সময় এক লোক সাঁৎ করে বুদের পেছন দিকে চলে গেল। তাকে লক্ষ করল না ও। হনহন করে এগোল সামনের দিকে। লোকটি ডা. মোস্তাফিজুর রহমান নয়, তবে অন্য কেউ, অন্য আরেকজন।

সময় কাটাতে রোজী মধুমিতা হল-এ গিয়ে ঢুকল। প্রথমে ভেবেছিল পরিচিত কারও বাসায় যাবে। কিন্তু সুটকেস হাতে রোজীকে দেখলে তারা অবাক হয়ে যেসব প্রশ্ন করবে তাতে ওকে বিব্রতই হতে হবে। তাই চিন্তাটা নাকচ করে সিনেমা হল-এ চলে এসেছে ও।

মধুমিতায় কেভিন কস্টনারের 'ওয়াটার ওয়ার্ল্ড' চলছে। ভিড় টিড় নেই। কাউন্টার প্রায় ফাঁকাই বলা যায়। ডিসি'র একটা টিকিট কিনে দোতলায় চলে এল রোজী। ভাগ্যিস ইভনিং শো শুরু হয়ে গেছে। তাই তেমন কারও অবাক চাউনির মুখোমুখি হতে হলো না ওকে। নইলে মস্ত পেট নিয়ে, হাতে সুটকেস ঝুলিয়ে ছবি দেখার খায়েশ কোন বাঙালী মেয়ের হয় কিনা এ নিয়ে এতক্ষণে দর্শকদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে যেত। টিকিট চেকার সহানুভূতি দেখিয়ে নিজে ওকে সীটে বসিয়ে দিয়ে গেল। পর্দায় তখন রীতিমত মারামারি চলছে। দর্শক হাঁ করে দেখছে সেই দৃশ্য।

রোজীর চোখ পর্দায় কিন্তু মনের ভেতরে ঝড় শুরু হয়ে গেছে। পেটের বাচ্চাটা বোধহয় ঘুমাচ্ছে, নড়াচড়া টের পাওয়া যাচ্ছে না।

আটটা বাজার মিনিট বিশেক আগে সিনেমা হল থেকে বের হয়ে এল রোজী। শায়লা বেগমের চেম্বার সেগুনবাগিচায়। একটা

রিকশা নিল ও। স্কুটারে ঝাঁকুনি বেশি। এই সময়ে কোন ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।

জ্যাম-ট্যামের বাধা পার হয়ে শায়লা বেগমের চেম্বারে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সোয়া আটটা বেজে গেল। সেই জানুয়ারিতে কবে একবার এখানে এসেছিল রোজী। আজ আবার এল। শায়লা তাঁর বাড়ির একতলাটা চেম্বার বানিয়েছেন। দোতলায় উনি নিজে থাকেন।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকল রোজী। সদর দরজা বন্ধ দেখে অবাক হলো। শায়লা বেগমের অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটা কোথায় গেল? সে বেল টিপল।

মিনিট তিনেক পরে দরজা খুললেন শায়লা নিজেই। মেরুন রঙের সালোয়ার কামিজ তাঁর ফর্সা চেহারায় দারুণ মানিয়েছে। গায়ে সাদা অ্যাপ্রন জড়ানো, পায়ে চপ্পল। তাঁকে দেখতে আরও কম বয়েসী এবং সুন্দরী লাগল রোজীর।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন শায়লা। 'আসুন। আমি মাত্র ফিরেছি হাসপাতাল থেকে।' ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে রোজী বলল, 'আমি দরজা বন্ধ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আপনার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল না?'

'সে ছুটিতে,' বললেন শায়লা। রোজীকে নিয়ে তাঁর কনসালটিং রুমে ঢুকলেন। ঘরটা মোস্তাফিজুর রহমানের রিসেপশন রুমের অর্ধেক। রোজী একটা চেয়ারে বসল পা দুটো আড়াআড়ি ভাবে রেখে, সুটকেসটা পাশেই থাকল।

নিজের আসন গ্রহণ করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন শায়লা। 'বলুন?'

যতদূর সম্ভব উত্তেজনা চেপে রেখে সব কথা বলে গেল রোজী। বলল ক্লেমেন্ট গোমেজ এবং তার ছেলে ও পুত্রবধূর কথা; জানাল মাসের পর মাস ধরে কবিরাজী নির্যাস খেয়ে তার পেটে কি প্রচণ্ড

ব্যথা উঠেছিল, তার কথা; আলবার্ট ভেডিড এবং তার বই সম্পর্কেও বলল সে। 'টাইটানিক' দেখা নিয়ে সীমান্তর লুকোচুরি, গিফট পাওয়া কালো মোমবাতি, শোভন রহমানের অন্ধ হয়ে যাবার ঘটনা ইত্যাদি খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দিল না। শান্ত থাকার চেষ্টা করলেও পারল না রোজী। কখনও উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল, কোন কোন প্রসঙ্গে আতঙ্কে নীল হয়ে উঠল মুখ। সীমান্তর বই ফেলে দেয়ার ঘটনা এবং মোস্তাফিজুর রহমানের চেম্বারের ঘটনাও খুলে বলল ও।

'আলবার্ট ডেভিডের "কোমা" বা শোভন রহমানের অন্ধত্বের ব্যাপারটি স্রেফ কাকতালীয় কোন ঘটনাও হতে পারে,' সবশেষে মন্তব্য করল রোজী। 'ওদের ইএসপি ক্ষমতা থাকতে পারে যা দিয়ে মানুষের ক্ষতি করা সম্ভব। তবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ওরা বাচ্চাটাকে চায়। এবং যেভাবে হোক আমার সন্তানকে ওরা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবেই।'

'আপনার কথা শুনে তাই মনে হচ্ছে,' বললেন শায়লা বেগম, 'বিশেষ করে শুরু থেকেই তারা এ ব্যাপারে যেরকম আগ্রহ দেখিয়েছে তাতে এ ধরনের ঘটনা ঘটা বিচিত্র কিছু নয়।'

চোখ বুজল, ইচ্ছে করল কেঁদে বুকটা খালি করে। অন্তত একজন মানুষকে সে বিশ্বাস করাতে পেরেছে। শায়লা বেগম তাকে পাগল ঠাওরাননি। চোখ মেলল ও, তাকাল ডাক্তারের দিকে। একটা প্যাডে কি যেন লিখছেন তিনি নিবিষ্ট চিত্তে। ওঁকে কি সব রোগীই পছন্দ করে? মনে মনে ভাবল রোজী।

কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে চাইলেন শায়লা বেগম। 'ডাক্তারের কি নাম বললেন? মাহমুদুর রহমান?'

'মোস্তাফিজুর রহমান,' বলল রোজী। 'চেনেন ওঁকে?'

'একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল,' আবার লেখায় মন দিয়েছেন শায়লা।

'মানুষটাকে দেখলে মনেই হয় না যে উনি এত—'

রোজীকে বাধা দিলেন শায়লা। 'আপনি কি আজই মেডিকেলে ভর্তি হতে চান, মিসেস হাসান?'

রোজীর মুখে হাসি ফুটল। 'যদি কোন সমস্যা না থাকে।'

'কেবিন পাওয়াটাই সমস্যা। অবশ্য পেয়িংবেড পাওয়া যেতে পারে। থাকতে পারবেন?'

'পারব,' দৃঢ় গলায় বলল রোজী। 'হাসপাতালের যেখানে আমাকে রাখবেন আমি কোন আপত্তি করব না।'

'তার আগে আপনাকে একটু পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

'আমার কোন আপত্তি নেই,' বলল রোজী।

উঠে দাঁড়ালেন শায়লা বেগম। 'আসুন আমার সাথে।' পেছনে, একটা প্রায় অন্ধকার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন তিনি। ঘরে হালকা-নীল আলো জ্বলছে। তাঁর পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল রোজী। ঘরের চারপাশের দেয়ালে নীল পর্দা টানা। শায়লা বেগম এয়ারকুলারের সুইচ অন করে দিলেন। মুহূর্তে গুনগুন শব্দে ভরে গেল ঘর।

'আমাকে কি কাপড় খুলতে হবে?' জিজ্ঞেস করল রোজী।

'না। না। এখনই তার প্রয়োজন নেই।' বললেন ডা. শায়লা। 'আপনি এখন আধাঘণ্টা স্রেফ রেস্ট নিন। আমি মেডিকেলে ফোন করব। ভাগ্য ভাল থাকলে কেবিন পেয়েও যেতে পারেন।' দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

রোজী ঘরের দূর প্রান্তের সিঙ্গল বেডটাতে গিয়ে বসল। খুব নরম বিছানা। সে হাতব্যাগটা রাখল একটা চেয়ারের ওপর। ভাবতে লাগল শায়লা বেগমের কথা।

সত্যি, শায়লা বেগমের তুলনা হয় না। সেই কবে একদিন পরিচয় হয়েছিল অথচ তিনি আজও তা ভোলেননি। শুধু কি তাই, রোজী আরেকজন ডাক্তার দেখিয়েছে বলে হিংসাও করেননি।

হিংসা করলে কি আর তাঁর চেম্বারে তিনি ওকে আসতে বলতেন? বরং কি চমৎকার আন্তরিক ব্যবহার তাঁর। এখন খোঁজ নিতে গেছেন কেবিনের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তার জন্য। আহা! এমন ডাক্তার ক'জন হয়? যারা বলে ডাক্তাররা কসাইদের মত তাদের একবার শায়লা বেগমের কাছে আসা উচিত।

পায়ের স্যান্ডেল খুলে বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল রোজী। ঘরটা ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। বাচ্চাটা ওর পেটের ভেতর নড়াচড়া শুরু করে দিয়েছে, টের পেল ও। পরম মমতায় পেটে হাত বোলাল সে। আর ভয় নেই, সোনা। আমরা ঢাকা মেডিকেলের নিরাপদ পরিবেশে চলে যাচ্ছি। ওখানে একটা কেবিন জোগাড় হলে—

টাকা! উঠে বসল রোজী। খুলল হাতব্যাগ। গুনে দেখল পাঁচ হাজার টাকার মত আছে। এতে হবে তো? সম্ভবত হবে। সরকারী হাসপাতালে খরচপাতি তেমন নেই বলেই জানে রোজমেরী। দরকার হলে কারও কাছ থেকে ধার নেবে সে।

টাকাটা ব্যাগে পুরে আবার বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল রোজী। হাতে ক্যাপসুলের শিশিটা। ক্যাপসুলগুলো শায়লা বেগমকে দিতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল রোজমেরী। উনি পরীক্ষা করে দেখবেন এরমধ্যে ক্ষতিকর কিছু আছে কিনা। মনে হয় নেই। কারণ ওরা তো স্বাস্থ্যবান বাচ্চাই চায়। শয়তানকে নাদুসনুদুস বাচ্চা উৎসর্গ করার জন্যই তো ওদের এই ষড়যন্ত্র।

শরীরে কাঁটা দিল রোজীর।

দানব! ওদের প্রত্যেকে একেকটা মূর্তিমান দানব।

চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল রোজীর প্রবল ঘৃণায়। ঠিক তখন পেটের ভেতর তীব্র একটা ব্যথা উঠল ওর। ককিয়ে উঠল ও। জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। ধীরে ধীরে আবার ব্যথাটা চলে

গেল।

সময় হয়ে এসেছে ওর বুঝতে পারল রোজী। শায়লা বেগমকে বলতে হবে কথাটা।

*

ঠাণ্ডা ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিল রোজী। ঘুম ভাঙল কাঁধে শায়লা বেগমের নাড়া খেয়ে। তাঁর দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসল সে। 'সরি, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টেরই পাইনি।' চোখ কচলাচ্ছে ও।

শায়লা বেগম কোন কথা বললেন না। উঠে দরজার কাছে হেঁটে গেলেন, কবাট দুটো মেলে ধরলেন। ভেতরে, একসাথে ঢুকলেন ডা. মোস্তাফিজুর রহমান এবং সীমান্ত হাসান। আর একই পথ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন শায়লা।

উঠে বসল রোজী. নিজের অজান্তে হাত থেকে নেমে গেছে চোখ।

ওরা ওর কাছে এসে দাঁড়াল। সীমান্তর চেহারা থমথম করছে, দৃষ্টি ভাবলেশহীন। রোজী নয়, সে তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে। ডা. মোস্তাফিজুর রহমান বললেন, 'আমাদের সঙ্গে চলো, রোজমেরী। চিৎকার দেবে না বা কোন সিন ক্রিয়েটের চেষ্টা করবে না। যদি প্রেতচর্চা বা প্রেত পূজারীদের নিয়ে আহাম্মকের মত চেঁচামেচি শুরু করো তাহলে আমরা তোমাকে জোর করে মানসিক হাসপাতালে নিয়ে যাব। ওখানে সন্তান ডেলিভারির সুযোগ-সুবিধে নেই বললেই চলে। তুমি নিশ্চয়ই তা চাইবে না? কাজেই সুবোধ মেয়ের মত জুতো পরে চলো আমাদের সাথে।'

'এখন আমরা বাড়ি যাব,' স্ত্রীর দিকে ফিরল সীমান্ত। 'ভয়ের কিছু নেই। তোমাকে কেউ খেয়ে ফেলবে না।'

'বাচ্চারও কোন ক্ষতি হবে না,' যোগ করলেন মোস্তাফিজুর রহমান। 'নাও, জুতো পায়ে দাও।' তিনি ক্যাপসুলের শিশিটা নিয়ে

পকেটে রাখলেন।

পায়ে জুতো গলাল রোজী। ডাক্তার ওর হাতে হ্যান্ডব্যাগটা ধরিয়ে দিলেন। রোজীর একটা বাহু চেপে ধরলেন তিনি একদিক থেকে, অন্য পাশ দিয়ে সীমান্ত ওর কনুই ধরে রাখল। তারপর তিনজন বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

শায়লা বেগমের হাতে রোজীর সুটকেস। তিনি সীমান্তকে ওটা দিলেন।

'ও এখন ভালই আছে,' রোজীর দিকে ইঙ্গিত করলেন ডাক্তার মোস্তাফিজ। 'আমরা ওকে বাসায় নিয়ে যাচ্ছি রেস্ট নিতে।'

শায়লা বেগম রোজীর দিকে তাকালেন শুধু, কিছু বললেন না।

'কষ্ট করে ফোন করার জন্য ধন্যবাদ, ডক্টর,' বললেন মোস্তাফিজুর রহমান।

সীমান্ত বলল, 'আমি খুবই লজ্জিত যে আমার স্ত্রী না বলে এখানে চলে এসেছে—'

ডাক্তার মোস্তাফিজুর রহমানের দিকে তাকিয়ে সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে শায়লা বেগম বললেন, 'আপনাদের উপকারে যে আসতে পেরেছি তাতেই আমি ধন্য, স্যার।' উনি তারপর সদর দরজাটা খুলে দিলেন।

ডাক্তার মোস্তাফিজুর রহমান নিজের গাড়ি নিয়ে এসেছেন। ড্রাইভিং সীটে বসা রোজীদের প্রতিবেশী নজরুল সিদ্দিকী। সে রোজীর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। রোজী তাকে খেয়াল করল না। যন্ত্রচালিতের মত গাড়িতে উঠে বসল। তার দু'পাশে বসলেন মোস্তাফিজুর রহমান এবং সীমান্ত।

কেউ কোন কথা বলল না।

গাড়ি ছেড়ে দিল নজরুল সিদ্দিকী। গন্তব্য—ড্রিম হাউজ।

*

লবি পার হয়ে ওরা লিফটম্যানের দিকে এগোচ্ছে, নিগ্রো চেহারার হারেস উদ্দিন রোজীর দিকে তাকিয়ে ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল। রোজীকে সে খুব পছন্দ করে। রোজীর ব্যবহার ভাল বলেই শুধু নয়, মাঝে মধ্যে পাঁচ-দশ টাকা বকশিশও সে পেয়ে থাকে ওর কাছে।

হারেস উদ্দিনের হাসি, রোজীর ভেতরে কি যেন একটা নাড়া দিয়ে গেল, ঘোর লাগা অবস্থা থেকে হঠাৎ যেন বাস্তবে ফিরে এল সে।

রোজী তার হ্যান্ডব্যাগের চেন খুলল, হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে, কিছু একটা খুঁজতে খুঁজতে লিফটের দরজার সামনে চলে এসে, এমন সময় ভান করল যেন ব্যাগটা হাত থেকে পড়ে যাচ্ছে। আসলে ইচ্ছে করে ও হ্যান্ডব্যাগটা ছেড়ে দিল। শুধু চাবির গোছাটা ওর হাতে, বাকি সব জিনিসপত্র—লিপস্টিক, কয়েনসহ আরও হাবিজাবি জিনিস মাটিতে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল। বোকাবোকা চেহারা নিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল রোজী।

সীমান্ত এবং মোস্তাফিজুর রহমান ঝুঁকল ওগুলো তুলে নেয়ার জন্য, বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রোজী। 'ইস্! ইস্!' করতে করতে লিফট থেকে বেরিয়ে এল হারেস উদ্দিন, উদ্ধার কাজে সে-ও লেগে গেল। নড়ে উঠল রোজী, সরে দাঁড়াল ওদের কাছ থেকে, দেখছে তিনজন ব্যস্ত মানুষকে, ওদের অলক্ষে স্যান্ডেলের ডগা দিয়ে চেপে ধরল গোলাকার, বড় ফ্লোর বাটন। তার পরপরই সেঁধিয়ে গেল সে লিফটের ভেতর। রোলিংডোরটি শব্দ করে বন্ধ হতে শুরু করেছে, লাফিয়ে উঠল হারেস উদ্দিন। 'আরে, আরে, আফা। করেন কি?' বলে হাত বাড়াল সে। কিন্তু বিদ্যুৎচালিত রোলিংডোর তার আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। সময় মত ডোর থেকে হাত সরিয়ে না নিলে আঙুলগুলো ছেঁচে যেত হারেস উদ্দিনের।

রোজী এবার 'সাত' লেখা বোতামে চাপ দিল। তিনজন বিমূঢ় মানুষের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল ও স্বয়ংক্রিয় লিফটডোর বন্ধ হতে। সাঁ সাঁ করে লিফট ওপরে উঠতে শুরু করল।

সাততলায় এসে থেমে গেল লিফট, খুলে গেল দরজা। নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে এগোল রোজী দ্রুত। জানে ওকে ধরার জন্য সীমান্তরা সার্ভিস এলিভেটর ব্যবহার করবে। আর এখানে চলে আসতে পারে যে কোন মুহূর্তে।

নিজের ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল রোজী। হাঁপাচ্ছে। পেটের ভীষণ যন্ত্রণাটা আবার শুরু হয়ে গেছে। তালায় চাবি ঢোকাল ও। মোচড় দিল। খুলছে না। এমন সময় হলওয়েতে বুটের শব্দ উঠল। আসছে ওরা!

'ঈশ্বর, বাঁচাও!' আর্তনাদ করে উঠল রোজী। আবার মোচড় দিল চাবিতে। খুলছেই না। হঠাৎ খেয়াল করল উত্তেজনায় ভুল চাবি ঢুকিয়েছে সে তালায়। ডজনখানেক চাবি থেকে সঠিক চাবিটা খুঁজে বের করতে মূল্যবান কয়েকটা সেকেন্ড নষ্ট হলো। এদিকে আরও কাছিয়ে এসেছে পায়ের আওয়াজ। ওই তো দেখা যাচ্ছে সীমান্তকে। দৌড় দিল। 'রোজমেরী, শোনো!' চেঁচিয়ে বলল ও।

'না!' গোঙানি বেরিয়ে এল রোজীর মুখ থেকে। খুট্ করে খুলে গেল তালা। ভারী শরীর নিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের মত ঘরে ঢুকে পড়ল। সেই মুহূর্তে থাবা চালাল সীমান্ত। এক চুলের জন্য ছুঁতে পারল না ও রোজীকে। হাতটা গিয়ে পড়ল শক্ত কাঠের দরজার ওপরে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল ও। রোজী ততক্ষণে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ও। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। ব্যথাটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে।

'দরজা খোলো, রোজ,' ডাকল সীমান্ত।

'নরকে যাও তুমি!' খেঁকিয়ে উঠল রোজমেরী।

'তোমাকে আমি কিছু বলব না, সোনা।'

'তুমি আমার বাচ্চাকে নিয়ে কি ষড়যন্ত্র পাকিয়েছ, জানি না ভেবেছ? দূর হও বলছি!'

'ষড়যন্ত্র? কিসের ষড়যন্ত্র?' দরজার ওপাশ থেকে উঁচু গলায় বলল সীমান্ত। 'আমি কেন আমাদের বাচ্চা নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে যাব?'

'রোজমেরী?' ডাক্তার মোস্তাফিজুর রহমানের গলা শোনা গেল এবার।

'আপনিও একটা শয়তান,' বলল রোজমেরী। 'এখান থেকে চলে যান।'

ওরা আরও কি কি যেন বলছিল, ভ্রূক্ষেপও করল না রোজী। সোজা গিয়ে ঢুকল বেডরুমে। ফোন করল সীমার নম্বরে। এক মহিলা বলল, 'আম্মায় তো রংপুর গেছে গা। আফনে কেডা...'

রিসিভার রেখে দিল রোজী। ভাবতে বসল আর কাকে ফোন করা যায়। বরিশালে করবে? এমন বিপদের সময় বাবা কি ওকে সাহায্য করবেন না? মুখ ফিরিয়ে নেবেন? বুক ঠেলে কান্না এল ওর। বাবা না এলেও মা যেভাবেই হোক আসবে। আচ্ছা, বরিশালের বাসার নাম্বারটা যেন কত? ছোট একটা ইনডেক্সে ঢাকার বাইরের নাম্বারগুলো টুকে রেখেছে রোজী। কোথায় যেন রেখেছে? ও হ্যাঁ, লকারের ওপরের ড্রয়ারে।

কিন্তু বার পাঁচেক চেষ্টার পরেও লাইন পেল না রোজী। শেষে ট্রাঙ্ককল করার সিদ্ধান্ত নিল। অপারেটরকে নিজের নাম্বার দিয়ে বলল, 'যত তাড়াতাড়ি পারেন নাম্বারটা আমাকে ধরে দিন, ভাই। খুব জরুরী।'

রিসিভার মাত্র নামিয়ে রেখেছে রোজী, এমন সময় ফিসফিসে কণ্ঠস্বর শোনা গেল দরজার বাইরে। কারা যেন কথা বলছে।

আতঙ্কে দাঁড়িয়ে পড়ল রোজী।

ঘরে ঢুকল সীমান্ত এবং নজরুল সিদ্দিকী। 'ডার্লিং,' মোলায়েম গলায় বলল সীমান্ত, 'আমরা তোমাকে ব্যথা দেব না।' তার পেছন পেছন এলেন ডা. মোস্তাফিজুর রহমান, হাতে ওষুধ ভরা ইঞ্জেকশন, সূঁচ দিয়ে বিজবিজ করে তরল পদার্থটা পড়ছে, প্লাঞ্জারটা চেপে রেখেছেন বুড়ো আঙুল দিয়ে। তাঁর সঙ্গী হিসেবে দেখা গেল রিটায়ার্ড ডেন্টিস্ট, স্টিফেন গনজালেস, রানু অধিকারী এবং ছ'তলার সেই দুই বোনকে।

'আমরা সবাই তোমার বন্ধু,' বললেন রানু অধিকারী। 'ভয় পাবার কিছু নেই, রোজমেরী; বিশ্বাস করো আমরা তোমার কোন ক্ষতি করব না।'

সিরিঞ্জটা উঁচু করে ধরলেন মোস্তাফিজুর রহমান। 'এটা একটা হালকা সিডেটিভ,' বললেন তিনি। 'ওষুধটা তোমার উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করবে। রাতে ভাল ঘুম হবে।'

রোজীর মাথায় একশো মাইল বেগে চিন্তার ঝড় বইছে। সন্দেহ নেই স্টিফেন গনজালেসের কাছ থেকে ওরা বিকল্প চাবি জোগাড় করেছে। এই লোকও এদের সাথে জড়িত, এই ব্যাপারটা আর বিস্মিত করতে পারছে না ওকে। বিস্মিত হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে সে। রোজী ভাবছে বৃত্তাকারে এগিয়ে আসতে থাকা লোকগুলোর মাঝ দিয়ে দৌড় দেবে কিনা। কিন্তু বৃত্তটা এত ঘন যে সে সুযোগ ওর নেই বললেই চলে।

'সত্যি তোমার কেউ ক্ষতি করবে না, রোজ,' বলতে বলতে সোহাগ করে হাত বাড়িয়েছিল সীমান্ত, ঝট্ করে রিসিভারটা তুলে নিয়ে দড়াম করে ওর মাথায় বাড়ি মারল রোজী। বাড়িটা খেয়ে 'উহ্' করে উঠল সীমান্ত। কিন্তু দ্বিতীয়বার আঘাত হানার সুযোগ পেল না রোজী, তার আগেই ওর কব্জি ধরে মুচড়ে দিল সীমান্ত। হাত থেকে পড়ে গেল রিসিভার।

'আমাকে বাঁচাও!' চিৎকার শুরু করে দিল রোজী। একই সাথে নজরুল সিদ্দিকী। একটা রুমাল মুখে পুরে দিল তার। শক্ত হাত দিয়ে চেপে ধরে থাকল মুখ।

ওকে বিছানার পাশ থেকে হিঁচড়ে নিয়ে এল কয়েকজন, দেয়ালের গায়ে চেপে রাখল। হাইপডারমিক সিরিঞ্জ ও তুলো নিয়ে এগিয়ে এলেন ডা. মোস্তাফিজুর রহমান। কাটা সাপের মত মোচড় খাচ্ছিল রোজী, ওকে কয়েকজোড়া সবল হাত ঠেসে ধরল। আর নড়াচড়া করতে পারল না সে। একজন ওর চোখে হাত চাপা দিল। দম বন্ধ হয়ে এল রোজীর, মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। একটা হাতের স্পর্শ পেল সে পেটের ওপর, টিপেটুপে দেখছে। শুনল ডা. মোস্তাফিজুর রহমান বলছেন, 'আরে, ওর দেখি সময় হয়ে এসেছে। আর তো দেরি করা যায় না।'

নীরবতা নেমে এল ঘরের ভেতর। দরজার বাইরে থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ, 'ওর বাচ্চা হবার সময় হয়ে গেছে!'

চোখ খুলতে পারছে না রোজী, নড়াচড়া করতে ব্যর্থ হচ্ছে। হঠাৎ টের পেল বাঁ হাতে ঠাণ্ডা কি যেন একটা জিনিস ঘষে দেয়া হচ্ছে। পরক্ষণে সূঁচ ফোটার তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল রোজী।

ভয়ে-আতঙ্কে এমন অবস্থা হলো যে নড়াচড়া করার কথাও ভুলে গেল ও বেমালুম।

চোখের ওপর থেকে হাতটা সরে গেল। পিটপিট করে রোজী দেখল ডা. মোস্তাফিজুর রহমানের হাতে খালি সিরিঞ্জ, তিনি তুলো দিয়ে ঘষে দিলেন রোজীর ইনজেকশনের জায়গাটা।

রোজী দেখল ওর জন্য নতুন চাদর পাতা হচ্ছে বিছানায়। কেন, বুঝতে অসুবিধে হলো না ওর।

তাই বলে এখানে?

এভাবে?

রোজীর মাথা ঝিমঝিম করছে। চিন্তাশক্তিগুলো কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। পেটে ব্যথার ঢেউ উঠছে একের পর এক। ওটা কি সত্যি সিডেটিভ ছিল নাকি ডাক্তার ওকে ডুশ দিয়েছেন প্রসব বেদনা তোলার জন্য?

দলটা যখন রোজীকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিতে গেল, প্রাণপণে নিজেকে আবার মুক্ত করার চেষ্টা করল সে। সীমান্ত কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'ডার্লিং, শপথ করে বলছি তোমার কোন ক্ষতি হবে না। সব কিছু আমাদের ওপর ছেড়ে দাও। এমন করে না, লক্ষ্মীটি!'

আরেকটা ব্যথার ঢেউ আছড়ে পড়ল পেটে।

চিৎ করে বিছানায় শোয়ানো হয়েছে রোজীকে, ডা. মোস্তাফিজুর রহমান আরেকটা ইনজেকশন দিলেন ওকে।

রানু অধিকারী রোজীর কপালের ঘাম মুছে দিলেন।

ঠিক এই সময় বেজে উঠল ফোন।

রোজী শুনল সীমান্ত বলছে, 'না, ভাই। বরিশালে আমাদের এখন কোন দরকার নেই। ট্রাঙ্ককলটা ক্যান্সেল করে দিন।'

আবার প্রবল ব্যথার ঢেউ! রোজী টের পেল চেতনা হারাতে চলেছে সে, শরীরটা যেন মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

মা হওয়ার জন্য সমস্ত পরিশ্রম বিফলে গেল রোজীর। সমস্ত শক্তির খামোকাই অপচয় হলো। ও বুঝতে পেরেছে এটা স্বাভাবিক প্রসব নয়। ওরা জোর করে ঘটনাটা আগে ভাগেই ঘটাচ্ছে।

অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে ফুঁপিয়ে উঠল রোজী: হায়, অদিতি, হায় আমার আদিত্য! আমি দুঃখিত, আমার ছোট্ট সোনা! আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো।

বিশ

ধীরে ধীরে চোখ মেলল ফ্লোরা রোজমেরী।

আলোর বন্যা চারিদিকে।

ধবধবে সাদা ছাদ।

দুই পায়ের মাঝখানে তীব্র ব্যথা।

সীমান্তকে দেখতে পেল রোজী। বসে আছে বিছানার ধারে, উদ্বিগ্ন, আড়ষ্ট হাসি ঠোঁটে।

'হাই,' ডাকল ওকে সীমান্ত।

'হাই,' মৃদু গলায় জবাব দিল রোজী।

ব্যথাটা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। এমন সময় মনে পড়ে গেল কথাটা। শেষ পর্যন্ত ঘটেছে ঘটনা? ভূমিষ্ঠ হয়েছে ওর সন্তান?

'সব ঠিক আছে তো?' ব্যাকুল গলায় জানতে চাইল রোজী।

'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে,' বলল সীমান্ত।

'কি হয়েছে?'

'ছেলে।'

'সত্যি? ছেলে?'

মাথা ঝাঁকাল সীমান্ত।

'ঠিক আছে তো আমার বাচ্চা? সুস্থ আছে?'

'আছে।'

আপনাআপনি চোখ দুটি মুদে এল রোজীর, তারপর আবার, প্রায় জোর করে চোখ মেলে চাইল সে।

'কি করছে ও এখন?'

'ঘুমাচ্ছে,' বলল সীমান্ত।

চোখ বুজল রোজী এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরে অতীতের আরও অনেক কথা মনে পড়ে গেল রোজীর। চোখে চশমা লাগিয়ে রানু অধিকারী বিছানার পাশে বসে নিবিষ্ট মনে মাসুদ রানা পড়ছেন।

'আমার ছেলে কোথায়?'

লাফিয়ে উঠলেন রানু। 'মাগো!' বইটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল। ওটা মেঝে থেকে তুলতে তুলতে অভিযোগের সুরে বললেন, 'মানুষকে এভাবে চমকে দিতে আছে?'

'আমার ছেলে?' আগের সুরে প্রশ্ন করল রোজী।

'কোথায় সে?'

'এক মিনিট দাঁড়াও। আসছি,' উঠে দাঁড়াতে গেলেন তিনি, মোটা শরীর নিয়ে আবার বসে পড়লেন চেয়ারে। বললেন, 'সীমান্ত আর ডাক্তারকে ডেকে আনি। ওরা রান্নাঘরে আছে।'

'আমার ছেলে কোথায় বলছেন না যে?' ধমকে উঠল রোজী। কিন্তু রানু অধিকারী যেন ছুটে পালালেন জবাব না দিয়ে।

উঠে বসার চেষ্টা করল রোজী। অসম্ভব দুর্বল শরীর। পড়ে গেল বিছানায়। তলপেটে সাংঘাতিক ব্যথা। যেন ধারাল ছুরি দিয়ে ইচ্ছেমত কেউ খোঁচাচ্ছে ওখানে। শুয়ে থাকল ও। এক এক করে সব কথাই মনে পড়ে গেল ওর।

এখন রাত। পাঁচটা বাজে। ঢং ঢং করে এইমাত্র সময়টা জানিয়ে দিল দেয়াল ঘড়িটা।

সীমান্ত এবং ডা. মোস্তাফিজুর রহমান এসে দাঁড়ালেন রোজীর শিয়রের কাছে। দুজনেরই চেহারা ম্লান এবং বিষণ্ণ।

'আমার ছেলে কোথায়?' তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল রোজী।

সীমান্ত ওর মাথার পাশে বসল। একটা হাত মুঠিতে চেপে বলল, 'রোজ।'

'কোথায় ও?'

'রোজ...' আরও কি যেন বলতে চাইল সীমান্ত, স্বর ফুটল না। অসহায়ের মত তাকাল ডাক্তারের দিকে।

ডা. মোস্তাফিজুর রহমান সরাসরি রোজীর চোখে চোখ রাখলেন। তাঁর মিলিটারি গোঁফে নারকেলের টুকরো লেগে রয়েছে। 'সাংঘাতিক জটিলতা দেখা দিয়েছিল, রোজমেরী,' মুখ খুললেন তিনি, 'তবে ভয়ের কিছু নেই। ভবিষ্যতে আবার মা হতে পারবে তুমি।'

'আমার ছেলে—'

বিস্ফারিত হয়ে উঠল রোজীর চোখ।

'মারা গেছে,' বললেন তিনি।

সীমান্তর দিকে তাকাল রোজী।

মাথা ঝাঁকাল সে।

'ভুল পজিশনে ছিল বাচ্চাটা,' ব্যাখ্যা করলেন ডা. মোস্তাফিজুর রহমান। 'হাসপাতাল হলে হয়তো বাচ্চাটাকে বাঁচাতে কিছু একটা করতে পারতাম। কিন্তু এখানে সেই সুযোগ-সুবিধা তো ছিলই না, সময়ও পাইনি কিছু করার। জোর করে কিছু করতে গেলে তোমার জীবন বিপন্ন হত।'

সীমান্ত বলল, 'আমরা আবার সন্তান নেব, রোজ। যত শিগগির সম্ভব। তোমাকে কথা দিলাম।'

ডা. মোস্তাফিজুর রহমান বললেন, 'অবশ্যই আবার সন্তান নিতে

পারবেন। সামনের বার এরকম কোন ঘটনা আশা করি ঘটবে না। আসলে এ রকম মিসহ্যাপ দশ হাজারে একটা ঘটে। যদিও বাচ্চাটা বেশ নাদুসনুদুস আর নর্মাল ছিল।'

সীমান্ত সাহস যোগাতে স্ত্রীর হাতে চাপ দিল। হেসে বলল, 'যত দ্রুত সম্ভব...'

পালাক্রমে ওদের দু'জনকে দেখল রোজী। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'আমি আপনাদের কাউকে বিশ্বাস করি না। আপনারা মিথ্যা কথা বলছেন।'

'রোজ,' ডাকল সীমান্ত।

'আমার ছেলে মরেনি,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে রোজী। 'তোমরা ওকে নিয়ে গেছ, তোমরা শয়তান। তোমরা আমার বাচ্চাকে নিয়ে গেছ। তোমরা মিথ্যা কথা বলছ! মিথ্যা কথা বলছ!'

ডাক্তারের ইঙ্গিতে দু'হাতে সীমান্ত রোজীর কাঁধ চেপে ধরল, মোস্তাফিজুর রহমান পুট করে ওর হাতে একটা ইনজেকশন দিয়ে দিলেন।

দুপুরে রোজীর জন্য খাবার এল চিকেন সুপ আর কালিজিরা ভর্তা দিয়ে ভাত। খাওয়ার সময় সীমান্ত ওর বিছানার পাশে বসে থাকল। চাদরের একটা কোণা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল, 'এমন উন্মাদের মত আচরণ করা তোমার ঠিক হয়নি, রোজ। অবশ্য মোস্তাফিজ সাহেব বলেছেন এটা এক ধরনের রোগ। হিস্টিরিয়া মত অসুখ। গর্ভবতী নারীদের প্রসবের শেষ দিকে রোগটার লক্ষণ কারও কারও মাঝে দেখা দেয়।'

রোজী কোন কথা বলল না। চুপচাপ সুপ খেতে লাগল। তার চোখের কোণে এবং গালে শুকিয়ে আছে জলের দাগ।

'বুঝলাম মি. এবং মিসেস ডি সুজাকে প্রেত সাধক বলে ভাবার পেছনে যুক্তি আছে,' বলল সীমান্ত। 'কিন্তু আমাকে এবং ডাক্তার

সাহেবকে ওদের দলে ফেলে দিলে কেন?'

চুপ করেই রইল রোজী।

'তুমি আমাকেও প্রেত সাধক ঠাউরে নিয়েছ। বাহ্?' হাসার চেষ্টা করল সীমান্ত। 'অবশ্য ডাক্তার সাহেব বলেছেন প্রিপারটাম. মানে ওই হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হলে অনেক মেয়েই নাকি আবোল-তাবোল অনেক কিছু ভাবতে থাকে।'

এতক্ষণে কথা বলল রোজী, 'তুমি শোভন রহমানের সাথে টাই বিনিময় করতে গিয়েছিলে কেন?'

'আমি—কি করতে গেছি?' ভুরু কোঁচকাল সীমান্ত।

'শোভন রহমানের ব্যক্তিগত ব্যবহারের কোন জিনিস তোমার দরকার হয়ে পড়েছিল,' বলল রোজী, 'যাতে ওরা বাণ মেরে লোকটাকে অন্ধ বানিয়ে দিতে পারে। তাই ওর টাইটা তুমি নিয়েছিলে।'

স্থির চোখে তাকাল সীমান্ত স্ত্রীর দিকে। 'তুমি কি বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'অবশ্যই বুঝতে পারছ। আমি তো আর হিব্রু ভাষায় কথা বলছি না।'

'খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমি শোভন রহমানের কাছ থেকে তার টাই ধার করেছিলাম কোন অসৎ উদ্দেশ্যে নয়। ওর টাইটা খুব পছন্দ হয়েছিল আমার। তাই আমারটা ওকে দিয়ে ওরটা আমি নিয়ে নিই। তোমাকে ঘটনাটা বলিনি তুমি ঠাট্টা করবে সে ভয়ে। অথচ কি সব আবোল-তাবোল কথা বলছ তুমি।'

'তাহলে বলো—টাইটানিকের টিকিট জোগাড় করেছিলে কিভাবে?' চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্নটা করল রোজী।

'মানে?'

'মানে খুব সোজা,' বলল রোজী। 'তুমি রফিকুল ইসলামের কাছ থেকে টিকিট আনোনি। আমাকে মিথ্যা কথা বলেছ।'

'তাতেই আমাকে প্রেত সাধক ঠাউরে বসলে?' হেসে উঠল সীমান্ত। 'টিকিট দুটো আমাকে মধুমিতার মালিকের মেয়ে দিয়েছে। সে আমার ভক্ত। এই মেয়ে আমাকে প্রায়ই ফোন করত। তুমি খুব বিরক্ত হতে। আর সেই মেয়ে আমাকে ছবি দেখার জন্য টিকিট দিয়েছে তা জানলে কি ওই সময় তুমি আমাকে আস্ত রাখতে?'

'তুমি আমাকে বললেই পারতে!' অনুযোগ করল রোজী।

'আচ্ছা, যা গেছে যাক।' বলল সীমান্ত। 'তুমি ডাক্তার মোস্তাফিজুর রহমানকে খামোকা সন্দেহ করছ কেন?'

'খামোকা নয়। উনি আমাকে ট্যানিস রুট খেতে বাধ্য করেছেন। জিনিসটা প্রেত সাধনার কাজে ব্যবহার হয়, আমাকে ডেভিড আঙ্কেল বলে গেছেন। আর এই ট্যানিস রুট ডাক্তার নিজেও ব্যবহার করেন। তার রিসেপশনিস্ট নিজে আমাকে বলেছে।'

'হয়তো ওটাও ডি সুজা দম্পতিই ওঁকে দিয়েছেন। যেমন দিয়েছিলেন তোমাকে। তোমার কি ধারণা ওটা শুধু ডাইনীরাই ব্যবহার করে? কবিরাজী অনেক চিকিৎসায় ওটা ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তা জানো?'

রোজী আবার চুপ হয়ে গেছে।

সীমান্ত বলতে লাগল, 'শোনো, রোজমেরী। ডাক্তার বলেছেন তুমি এখন প্রিপারটাম রোগী। তোমার এখন মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা ঝেঁটিয়ে দিয়ে কমপ্লিট রেস্ট নেয়া দরকার।' ওর একটা হাত নিজের মুঠিতে তুলে নিল সীমান্ত। 'জানি, সন্তান হারানোর বেদনার তুলনা হয় না। আমারও কি কম কষ্ট হচ্ছে, বলো? তুমি ভেঙে পড়বে বলে আমি সমস্ত কষ্ট পাথর চাপা দিয়ে রেখেছি.' বলতে বলতে গলা ধরে এল সীমান্তর। পরক্ষণে উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সে, 'জানো, আনন্দমেলা কথাচিত্রের আগামী ছবির নায়ক হচ্ছি আমি। সোহানুর রহমান সোহানের মত তারকা পরিচালক ছবিটির ডিরেকশন দেবেন। আমার বিপরীতে নায়িকা শাবনূর। খ্রীস্টার

প্রডাকশন্স বম্বের সাথে যৌথ প্রযোজনার ছবি করবে। আমি ওটারও নায়ক। নায়িকা জুহি চাওলা। সামনে এখন আমাদের শুধুই সুদিন, রোজ। আগামী সংখ্যা "তারকা বিশ্ব" আমাকে নিয়ে কাভার স্টোরী করবে। ইন্টারভিউও নিয়ে গেছে। "তারকা বিশ্ব"-র মত পত্রিকার কাভার পাওয়া...বুঝতেই পারছ...'

উঠে দাঁড়াল সীমান্ত, এগোল দরজার দিকে। পেছন থেকে ডাকল রোজী। 'তোমার কাঁধ দেখি?'

থমকে দাঁড়াল সীমান্ত, ধীরে ধীরে ঘুরল।

'তোমার কাঁধ দেখতে দাও আমাকে,' একই সুরে বলল ও।

'ঠাট্টা করছ নাকি?'

'না। তোমার বাম কাঁধ আমি দেখতে চাই।'

রোজীর চোখে চোখ রাখল সীমান্ত। 'ঠিক আছে। দেখো।'

গরম লাগছিল বলে শুধু একটা টি শার্ট পরেছিল সীমান্ত। শার্টটা খুলে উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত করল ও। ঝুঁকল স্ত্রীর দিকে।

মেদহীন, ফর্সা শরীরের কোথাও কোন দাগ-টাগ নেই। শুধু বাম কাঁধে, যেখানে লালচে আঁচিলটা ছিল, সেখানে হালকা একটা দাগ লক্ষ করল রোজী।'

'আঁচিলটা কোথায় গেল?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হোমিওপ্যাথ খেয়ে ফেলে দিয়েছি,' বলল সীমান্ত। 'খালি গায়ে শূটিং করতে লজ্জা লাগত। কিন্তু তুমি আমাকে শার্ট খুলতে বললে কেন?'

'কারণ ছিল,' গম্ভীর গলায় বলল রোজী। 'তবে কারণটা তোমাকে আমি বলতে বাধ্য নই।'

দুধে ফুলে উঠেছে রোজমেরীর বুক। কালিজিরা ভর্তা দিয়ে ভাত খাওয়ার ফল। ওর অবশ্য জানা নেই কালিজিরা ভর্তা বা পেঁয়াজ

ভাজা দিয়ে ভাত খেলে সব মেয়ের বুকেই উপচে পড়ে দুধ। কারও বুকে রীতিমত দুধের নহর বইতে থাকে। যেমন ঘটেছে রোজীর বেলায়। কিন্তু ওর তো বাচ্চাই নেই, কাকে খাওয়াবে সে এত দুধ? দুধের চাপে বুক ফেটে যেতে চায় রোজীর, তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয় স্তনে। সমস্যার সমাধান করে দিলেন ডা. মোস্তাফিজুর রহমান। রাবারের ব্রেস্ট পাম্প নিয়ে এলেন তিনি। ওকে দেখিয়ে দিলেন পাম্পটা বুকে বসিয়ে কিভাবে পাম্প করে দুধ বের করে আনতে হবে। রোজী দুধ পাম্প করে, রানু অধিকারী, ফ্লোরেন্স অথবা স্টিফেন গনজালেসের মেয়ে এসে কাপে ভরে হালকা সবুজ রঙের ঘন দুধটা নিয়ে যায়। দুধ থেকে ট্যানিস রুটের অল্প অল্প গন্ধ পায় রোজী। দুধ আর পাম্প মেশিন নিয়ে যাওয়ার পরে অসম্ভব ক্লান্ত লাগে শরীর, বিছানায় শুয়ে পড়ে। বালিশে মুখ গুঁজে আঝোর ধারায় কাঁদতে থাকে।

রোজীকে দেখতে এল অনেকেই। ড্রিম হাউজের প্রত্যেকেই ওর সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানিয়ে গেল। এল সীমাও। তাকে জড়িয়ে ধরে রোজী কাঁদল খুব। এতবড় একটা দুর্ঘটনার পরেও মেয়েকে বাবা মা দেখতে আসেননি জেনে সীমা ক্ষোভ প্রকাশ করল। রোজী তাকে জানাল সীমান্ত বরিশালে ফোন করেছিল। কিন্তু সীমান্তর গলা চিনতে পেরে নাকি রোজীর বাবা সাথে সাথে ফোন রেখে দিয়েছেন। ওকে কথা বলার সুযোগই দেননি।

রোজীর এখন সময় কাটে টিভিতে নানা অনুষ্ঠান দেখে। সীমান্ত তাকে চোদ্দ ইঞ্চি সনি কিনে দিয়েছে একটা।

মাদ্রাজ থেকে চিঠি পেল রোজী একদিন। গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন ওকে মি. এবং মিসেস ডি সুজা।

দিন যত গেল, রোজীর পেটের সেলাই তত শুকিয়ে আসতে লাগল, সেই সাথে কমতে শুরু করল ব্যথা।

*

একদিন সকালে, রোজী মা হওয়ার হপ্তা তিনেক পরে, তার মনে হলো কোথায় যেন একটা বাচ্চা কাঁদছে। টিভি বন্ধ করে কান পাতল সে। উঁউঁ করে ভেসে এল কান্নার আওয়াজ। আওয়াজটা আরও ভাল করে শোনার জন্য বিছানা থেকে নেমে বন্ধ করে দিল ও এয়ার কন্ডিশনার।

ঠিক এই সময় পাম্প আর কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন রানু অধিকারী।

'একটা বাচ্চা কাঁদছে। শুনতে পাচ্ছেন?' তাঁকে জিজ্ঞেস করল রোজী।

দু'জনেই কান খাড়া করে শুনল।

হ্যাঁ, সত্যি। একটা বাচ্চা কাঁদছে।

'না, রোজমেরী,' বললেন রানু অধিকারী। 'আমি কোন কান্নাটান্না শুনতে পাইনি। যাও, শুয়ে পড়ো। তোমার হাঁটা-চলা একদম নিষেধ, জানো না? এসি বন্ধ করেছ কেন? বাপরে, এত গরমের মধ্যে কেউ এয়ারকুলার বন্ধ রাখে!' বকবক করতে করতে তিনি নিজেই এয়ার কুলারের সুইচ অন করলেন।

ওই দিন বিকেলে আবার শিশু কণ্ঠের কান্না শুনতে পেল রোজী। অদ্ভুত ব্যাপার, সাথে সাথে তার বুক থেকে দুধ পড়তে শুরু করল, ভিজিয়ে দিল ম্যাক্সি। রাতে সীমান্তকে ঘটনাটা খুলে বলল ও।

'আটতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছে,' বলল সীমান্ত। 'ওদের...'

কথা শেষ করতে দিল না রোজী। বলল, 'ওদের বাচ্চা আছে?'

'হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?'

সীমান্তর দিকে তাকাল রোজী। 'আমি বাচ্চাটার কান্না শুনেছি।'

পরদিন বাচ্চার কান্না আবার শুনতে পেল রোজী। তার পরদিনও।

টিভি দেখা বাদ দিল রোজী। এখন হাতে একটা বই নিয়ে শুয়ে থাকে পড়ার ভান করে। আসলে কান খাড়া করে শোনে ও...

আটতলা নয়, বাচ্চাটা কাঁদে সাততলার ফ্ল্যাট থেকেই।

ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে রোজী, বাচ্চাটা কাঁদতে শুরু করার কয়েক মিনিট পরেই প্রায় হন্তদন্ত হয়ে কেউ না কেউ পাম্প মেশিন এবং কাপ নিয়ে হাজির হয়ে যায়। আর দুধ নেয়ার কয়েক মিনিট পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যেন বাচ্চার কান্না বন্ধ হয়ে যায়।

একদিন সকালে, রানু অধিকারী ছয় আউন্সের মত দুধ পাম্প করার পরে তাকে রোজী জিজ্ঞেস করল, 'এটা দিয়ে কি করেন আপনারা?'

'কি আর করব। ফেলে দিই,' বলে চলে গেলেন ভদ্রমহিলা।

সেদিন বিকেলে আবার দুধের জন্য যথারীতি হাজির হয়ে গেলেন তিনি। দুধে কাপ বোঝাই করার পরে রোজী 'এক মিনিট' বলে কফি চামচটা কাপের মধ্যে চোবাতে যাচ্ছিল, ঝাঁকি খেয়ে সরে গেলেন রানু। 'আরে, আরে কি করছ?' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

'কেন কি হয়েছে?' ভাল মানুষের মত মুখ করে জানতে চাইল রোজী।

'খামোকা কাজ বাড়িয়ে কি লাভ?' বললেন রানু অধিকারী। 'চামচটা আবার ধুতে হত।'

আর তখুনি রোজী বুঝে ফেলল সে যে সন্দেহটা করেছে সেটাই ঠিক।

একুশ

বেঁচে আছে ও।

বেঁচে আছে ফ্লোরা রোজমেরীর সন্তান।

আর ওকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে রবার্ট এবং মিনির অ্যাপার্টমেন্টে।

ওরা ওকে রোজীর দুধ খাওয়াচ্ছে। ওর মনে পড়ে গেল অক্টোবর মাসের একত্রিশ তারিখ পিশাচ সাধকদের জন্য একটি বিশেষ দিন। আলবার্ট ডেভিডের বই পড়ে সে জেনেছে একত্রিশ অক্টোবরকে বলা হয় হ্যালোউইন ডে। ওইদিন পৃথিবীর যাবতীয় গোরস্থান থেকে উঠে আসে প্রেতাত্মারা। প্রেত সাধকরা শয়তানকে আহ্বান করে বিশেষ ওই দিনটিতে। ওরা নিশ্চয়ই একত্রিশে অক্টোবরের জন্য অপেক্ষা করছে। শয়তানকে সেদিন উৎসর্গ করবে রোজীর বাচ্চা। হয়তো বসে আছে রবার্ট আর মিনির অপেক্ষায়। ওঁরা ভারত থেকে ফিরলেই পিশাচ পূজার ষোলোকলা পূর্ণ হবে ওদের।

ওর সন্তান বেঁচে আছে, এই ভাবনা নতুন শক্তি যোগাল রোজীর দেহ-মনে। ওরা তাকে প্রতিদিন ঘুমের বড়ি খেতে দেয়। রোজী এখন আর বড়ি খায় না। ভান করে খাওয়ার, কিন্তু কৌশলে বুড়ো আঙুল আর তালুর মধ্যে চেপে রাখে স্লিপিং পিল, পরে তোষকের নিচে চালান করে দেয় বড়িটা।

নিজেকে আরও শক্তিশালী এবং জাগ্রত মনে হতে থাকে

রোজীর।

ভয় নেই আমার, আদিত্য, মনে মনে বলে সে। আমি, তোমার মা, আসছি তোমাকে শয়তানদের হাত থেকে উদ্ধার করতে।

শায়লা বেগমের কাছ থেকে মস্ত শিক্ষা পেয়েছে রোজী। তাই ও কাউকেই এখন আর বিশ্বাস করে না। একবার ভেবেছিল পুলিশকে ঘটনাটা জানাবে। কিন্তু পরক্ষণে নাকচ করে দিয়েছে চিন্তাটা। নিজের সন্তানকে শয়তানের উদ্দেশে উৎসর্গ করছে পিতা, কথাটা শুনলে হেসেই উড়িয়ে দেবে তারা। ডা. মোস্তাফিজুর রহমানও এই অশুভ চক্রের সাথে জড়িত, এমন কথাও কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। কারণ তিনি দেশের অত্যন্ত বিখ্যাত একজন চিকিৎসকই শুধু নন, বুদ্ধিজীবী হিসেবেও তাঁকে যথেষ্ট সম্মান এবং সমাদর করা হয়। কাছের মানুষ বলতে আছে শুধু বান্ধবী সীমা। কিন্তু সেও হয়তো পাগল ঠাউরে বসবে রোজীকে। ডাক্তার বা সীমান্ত, কে জানে, ইতিমধ্যে তার কাছে রোজীর নামে উল্টোপাল্টা কথা বলেছে কিনা। হয়তো বলেছে হিস্টিরিয়ায় রোজীর সামান্য মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখা দিয়েছে। সবাইকে প্রেত সাধক ভাবতে শুরু করেছে। পুলিশের কাছে গেলে ডাক্তার হয়তো একই কথা তাদেরকে বোঝাবেন। কাজেই রোজীকে এখন যা করার সব একা করতে হবে। সে চার্চে যাবে। প্রীস্টকে সব কথা খুলে বলবে। তিনি অন্তত বুঝবেন রোজী সত্যি কথাই বলছে। তার আগে ছেলেকে খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু কিভাবে?

বিদ্যুৎ চমকের মত রোজীর মনে পড়ে গেল মেইন হলরুমের শেষ মাথায় যে লিনেন ক্লজিটটা আছে, যেটা ওদের ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না, ওটার পেছন দিকে সাদা রং করা একটা প্যানেল দেখেছিল ও। প্যানেলটার একটা অংশ ঢালাই করাও ছিল বলে যেন মনে পড়ছে ওর। ওটা কোন গোপন দরজা নয়তো পাশের অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার? মি. গনজালেস তো বলেছিলেন ক্লজিটটা

ওখানে তৈরি হয়েছে বড় অ্যাপার্টমেন্টটাকে ভেঙে দুটো ছোটরুম করার জন্য। কুজিটটা হয়তো দেয়াল হিসেবে কাজ করছে। কুজিটে গোপন দরজা থাকতে পারে পাশের ফ্ল্যাটে ঢোকার শর্টকাট রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করার জন্য।

স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল রোজীর। সেই যে রাতে ডি সুজা দম্পতি ওকে তাঁদের হাতে বানানো চকোলেট খেতে দিয়েছিলেন। আর চকোলেট খাওয়ার পরে অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখেছিল রোজী। সেই স্বপ্নের একটা অংশ ছিল—সীমান্ত ওকে হলরুমে নিয়ে যাচ্ছে পাঁজাকোলা করে, তারপর যেন হাওয়ায় ভেসে ঢুকে পড়ল লিনেন কুজিটের মধ্যে...

এখন রোজীর সন্দেহ হচ্ছে আদৌ ওটা কোন স্বপ্ন ছিল কিনা ভেবে।

না, স্বপ্ন নয়। ওরা ওকে নেশা জাতীয় কিছু খাইয়ে অজ্ঞান করে ফেলেছিল। তারপর নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য চড়াও হয়েছে রোজীর ওপর। ওরা ওকে ধর্ষণ করেছে। আর সেই ধর্ষণে নীরব সম্মতি ছিল সীমান্ত হাসানের। নিজের ক্যারিয়ারের স্বার্থে এতবড় জঘন্য কাজটা সীমান্ত করতে পারল! ঘৃণায় রি রি করে ওঠে রোজীর শরীর। সেই মুহূর্তে কঠোর শপথ নেয় কাউকে ছেড়ে দেবে না সে। তার আগে তার মানিককে খুঁজে বের করতে হবে।

চোখ বুজে প্রার্থনায় বসে রোজী। শক্তি চায় ঈশ্বরের কাছে, সাহায্য চায় তার আদিত্যকে নিষ্ঠুর, নির্মম একদল পশুর হাত থেকে উদ্ধারের জন্য। অঝোরে কাঁদতে থাকে সে।

ঘুমের বড়ি দিয়েই কাজটা সারতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল রোজী। তোষকের তলা থেকে এক এক করে সবগুলো বড়ি বের করে

আনল ও। মোট আটটা। সাদা রঙের ছোট বড়ি। এই বড়ি খাইয়ে ওরা ওকে পঙ্গু করে দিতে চেয়েছে। এবার ওদেরকে এই বড়ি গেলাবে রোজী। ধুলো লেগে গিয়েছিল বড়িগুলোতে। সযত্নে ধুলো পরিষ্কার করল ও। তারপর একটা সাদা কাগজে বড়িগুলো মুড়ে বালিশের নিচে চালান করে দিল।

ক্লান্ত আর নিস্তেজের ভান করে আগের মতই বিছানায় পড়ে থাকল রোজী। দুপুরের খাবার খেল সুবোধ মেয়ের মত। রানু অধিকারী পাম্প করে যখন ওর বুক থেকে দুধ নিচ্ছেন তখন সে পত্রিকার পাতা ওল্টাতে থাকল।

সুযোগটা এল বিকেলে। রানু অধিকারী এক তরুণীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন রোজীর। বললেন, 'এ হচ্ছে রিয়া। স্টিফেন গনজালেসের মেয়ে। ইডেন কলেজে পড়ে। আজ বিকেলটা ও-ই তোমাকে সঙ্গ দেবে। কোন কিছু প্রয়োজন হলে ওকে বোলো। আমার একটু কাজ আছে। কাল সকালে আবার দেখা হবে, কেমন?' বলে তাড়াতাড়ি পাম্প করে দুধ নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

রোজী রিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল। এ তাহলে তার নতুন বডিগার্ড! সকাল এবং বিকেলে পালাক্রমে কেউ না কেউ ওর সাথে থাকছে। ওদের ভাষায় 'সঙ্গ দেয়া।' আসলে পাহারা দিচ্ছে। রোজী না আবার পালিয়ে যায়! এমনকি এ ঘরে ফোনের লাইনটা পর্যন্ত কেটে দেয়া হয়েছে। সীমান্ত বলেছে লাইন নষ্ট। আসলে রোজী বাইরে কোথাও যাতে ফোন করতে না পারে সে জন্য লাইন কেটে রেখেছে ওরা। ওরা এমন ভাব করে যেন রোজীর একটু সেবা করতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে। অথচ সম্পূর্ণ বন্দী জীবন-যাপন করতে হচ্ছে ওকে এই বাড়িতে। তবে আর বেশিদিন নয়। আদিত্যকে একবার খুঁজে পেলেই হলো। রোজী ঠিকই সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবে ছেলেকে নিয়ে।

রিয়ার বয়স আঠারো বা উনিশ। তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে ঝলমল করছে। এমন সুন্দরী মেয়েটাও কি প্রেত-পূজারীদের দলে? কে জানে?

রিয়া বলল, 'আন্টি, আপনার কিছু লাগবে?'

'আমার জন্য স্যান্ডউইচ বানাতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রোজী। 'খুব খিদে পেয়েছে। সেই সাথে কফি হলে মন্দ হয় না। তোমার জন্যও বানিয়ো।'

'অবশ্যই পারব,' মুক্তোর মত ঝিলিক দিল রিয়ার দাঁত। 'নিয়ে আসছি এখুনি।'

খানিক পরে চিজ স্যান্ডউইচ আর কফি নিয়ে এল রিয়া ট্রেতে করে।

রোজী বলল, 'কষ্ট করে একটু সস নিয়ে এসো, রিয়া। কিচেনের আলমারির ওপরের তাকে পাবে।'

'সরি, আন্টি,' লাজুক হাসল রিয়া। 'সসের কথা একদম মনে ছিল না।' উঠে গেল সে।

চট্ করে বালিশের তলা থেকে বড়ির প্যাকেটটা বের করল রোজী। সবগুলো বড়ি ঢেলে দিল রিয়ার কাপে। চামচ দিয়ে দ্রুত নাড়তে শুরু করল। বড়িগুলো কফির সাথে মিশে গেছে বুঝতে পেরে চামচটা টিস্যু দিয়ে মুছে নামিয়ে রাখল পিরিচের ওপর। তারপর নিজের কাপটা টেনে নিল সে। কিন্তু হাত এমনভাবে কাঁপছে যে কাপটা নামিয়ে রাখতে বাধ্য হলো রোজী।

মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এল রিয়া শূন্য হাতে। 'পেলাম না তো, আন্টি,' চেহারা ম্লান করে বলল। 'সবগুলো তাক খুঁজলাম। কোথাও সস নেই।'

'তাহলে বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। বাজার থেকে আর আনা হয়নি,' বলল রোজী। 'বোসো তুমি। খামোকা তোমাকে কষ্ট

দিলাম।'

'না না। ঠিক আছে,' বলল রিয়া।

ওর হাতে কফির কাপ ধরিয়ে দিল রোজী। 'নাও, কফি খাও।'

কফিতে চুমুক দিয়ে নাক কোঁচকাল রিয়া। 'ইস! বড্ড কড়া হয়ে গেছে কফিটা।'

'হ্যাঁ,' হাসি চেপে বলল রোজী। 'তবে কড়া কফি খেতেই আমার ভাল লাগে।'

ডিডি-৭ এ উত্তম-সুচিত্রার ছবি দেখাচ্ছে। রিয়ার খুব প্রিয় শিল্পী। সে কফির তেতো স্বাদের কথা ভুলে গেল ছবি দেখতে দেখতে।

রোজীর স্যান্ডউইচ খাওয়া হয়ে গেছে। আড়চোখে বারবার তাকাচ্ছে রিয়ার দিকে। রিয়া পুরো কফি খেয়েছে। মাঝে মাঝেই হাই তুলছে। একবার বিজ্ঞাপনের বিরতিতে মস্ত হাই তুলে বলল, 'বড্ড ঘুম পাচ্ছে, আন্টি।'

রোজী বলল, 'তাহলে ঘুমিয়ে পড়ো।'

'আরে না! এমন ছবি ছেড়ে আমি ঘুমাব? পাগল হয়েছেন?'

কিন্তু মিনিট পনেরো পরে আর চোখ খুলে রাখতে পারল না রিয়া। বুকের কাছে নেমে এল মুখ, বার দুই ঝাঁকি খেয়ে সজাগ হলো, তারপর সোফার কুশনে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। অল্প অল্প নাক ডাকছে সে।

'রিয়া?' ডাকল ওকে রোজী। জবাব দিল না রিয়া। অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

বিছানা ছেড়ে আস্তে নামল রোজী, পা ঢোকাল চপ্পলে, ঢোলা ম্যাক্সি পরেই নিঃশব্দে বেরিয়ে এল বেডরুম থেকে, বাইরে থেকে দরজায় খিল লাগিয়ে কিচেনে গিয়ে ঢুকল।

কিচেনের ছুরির তাকে বেশ ক'টা ঝকঝকে ছুরি একসারে সাজানো। সবচে' লম্বা এবং ধারাল ছুরিটা বেছে নিল রোজী।

হাতলটা হাড়ের তৈরি, ডগার দিকটা সূচালো, স্টীলের পাত ঝিকিয়ে উঠল আলোতে। ছুরিটা নিয়ে হলঘরের দিকে পা বাড়াল ও।

লিনেন ক্লজিটের দরজা খুলতে রোজী দেখল সে যা ভেবেছিল খাপে খাপে তা মিলে গেছে। ক্লজিটের শেলফগুলো পরিষ্কার, তবে ভেতরের কয়েকটা জিনিসে কারও হাত পড়েছে। যেখানে লেপ-কাঁথা থাকার কথা সেখানে হাত এবং গা মোছার তোয়ালে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

মাটিতে ছুরিটা রেখে রোজী ক্লজিট থেকে একে একে সব জিনিস নামাল। তোয়ালে ইত্যাদি সরানোর পরে দেখল ক্লজিটের পেছনের অংশে, সবচেয়ে উঁচু তাকটার ঠিক নিচে, সাদা রং করা একটা প্যানেল, তাতে ঢালাই-এর চিহ্ন। প্যানেল এবং ঢালাই যেখানে মিশেছে সে জায়গার রং-এর রেখা কেমন আঁকাবাঁকা হয়ে গেছে। প্যানেলের একটা অংশে চাপ দিল রোজী, তারপর অপর অংশে, চাপ বাড়াল ধীরে ধীরে, হঠাৎ প্যানেলটা ডেবে গেল ভেতরের দিকে, আধো আলো, আধো অন্ধকারের মধ্যে দৃশ্যমান হলো আরেকটা ক্লজিট। এই ক্লজিটের গায়ে আবার একটা 'কী-হোল'ও দেখা যাচ্ছে। আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে গর্তটা থেকে। ধাক্কা দিয়ে প্যানেলটা পুরো খুলে রোজী পা রাখল দ্বিতীয় ক্লজিটে। কী-হোল-এ চোখ লাগাল। দেখল হাত দশেক দূরে ছোট্ট একটা কেবিনেট দাঁড়িয়ে আছে রবার্ট ডি সুজাদের অ্যাপার্টমেন্টের হলওয়েতে।

দরজায় ধাক্কা দিল রোজী। খুলে গেল কবাট। দরজাটা বন্ধ করে নিজেদের ক্লজিটে ফিরে এল সে, মেঝে থেকে ধারাল ছুরিটা নিয়ে আবার দ্বিতীয় ক্লজিটে ঢুকল। আবার কী-হোল-এ চোখ রাখল, কাউকে না দেখে সামান্য খুলল দরজা। কারও কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে এবার পুরো দরজা মেলে ধরল রোজী, হাতে ছুরি বাগিয়ে পা

বাড়াল সামনে।

হলওয়েটা একদম খালি, তবে দূরের লিভিংরুম থেকে অস্পষ্ট কথা ভেসে আসছে। রোজীর ডান পাশে বাথরুম, দরজা খোলা। ভেতরে অন্ধকার। রবার্ট এবং মিনির বেডরুম বাঁ দিকে, বেডসাইড একটা বাতি জ্বলছে। কিন্তু ওখানে দোলনা বা শিশু কিছুই দেখা গেল না।

সাবধানে, পা টিপে টিপে হলওয়ে ধরে হাঁটতে শুরু করল রোজী। ডানদিকে একটা দরজা, বন্ধ; আর বাঁ দিকে একটা লিনেন ক্লজিট।

ছোট্ট কেবিনেটের মাথায় একটা তৈলচিত্র ঝুলছে। চার্চের ছবি আঁকা। জ্বলছে চার্চ। জানালা দিয়ে হলুদ আর কমলা রঙের শিখা বেরুচ্ছে, ছুঁই ছুঁই করছে ছাদ।

আগুনে চার্চ পুড়ে যাবার দৃশ্য কোথায় যেন দেখেছে রোজী?

ও হ্যাঁ। মনে পড়েছে। স্বপ্নের মধ্যে।

কিন্তু এটা কি করে সম্ভব?

তাহলে কি সত্যি ওরা ওকে এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিল এবং অয়েল পেইন্টিংটা রোজীর চোখে পড়েছিল? হতে পারে। চকোলেটের নামে ওরা আসলে ওকে ড্রাগস খাইয়েছিল। সে সম্পূর্ণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। সচেতন হয়ে নিজেকে বিছানায় দেখার পরে ভেবেছে দুঃস্বপ্ন দেখেছে।

তাহলে ওর গায়ে যে আঁকিবুঁকি করা হয়েছিল সেগুলো জেগে উঠে ও কেন দেখেনি? হয়তো ওরা পরে রং ধুয়ে ফেলেছিল। তাই হবে, ভেবে মাথা ঝাঁকাল রোজী। এখন এসব চিন্তা থাক। আগে আদিত্যকে খুঁজে বের করতে হবে।

ছোরাটা উঁচিয়ে ধরে আবার হাঁটতে শুরু করল রোজমেরী হাসান। আরেকটা ছবি চোখে পড়ল ওর। কতগুলো নগ্ন নারী-পুরুষ বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে নাচছে। হলঘরের মাথায়, লিভিংরুমের প্রায়

কাছে চলে এসেছে রোজী। উচ্চকিত একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'রোজী নিশ্চয়ই আমাকে তোমাদের দলে দেখে অবাক হয়েছে,' স্টিফেন গনজালেসের গলা। হাসির একটা রোল উঠল সঙ্গে সঙ্গে। কে যেন বলল, 'এই আস্তে!'

'এখন জোরে কথা বললেও ক্ষতি নেই,' মিসেস ডি সুজার কণ্ঠ। 'রোজমেরীর পাহারায় রিয়া আছে। তাছাড়া সে তো বিছানা ছেড়েই উঠতে পারে না। ও কোনদিন জানতেও পারবে না আমরা এখানে কি বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেছি।'

মিসেস ডি সুজা কথা বলছেন? উনি কবে ভারত থেকে ফিরলেন? রবার্টও কি ফিরেছেন? কিন্তু মাত্র পরশুদিন ওঁদের শুভেচ্ছা কার্ড পেয়েছে রোজী। আগ্রা থেকে চিঠি লিখেছেন ওঁরা। ওঁদের তো এখন ওখানেই থাকার কথা।

ওঁরা কি সত্যি ওখানে ছিলেন?

আদৌ কি ওঁরা দু'জন ভারতে গিয়েছিলেন?

তাহলে রোজী মিনিদের ঘর থেকে মাঝেমধ্যে যে চেয়ার বা টেবিল টানার আওয়াজ পেয়েছে তা শোনার ভুল নয়?

মোড় ঘুরল রোজী। হাতে উদ্যত ছুরি। সামনের দৃশ্যটা দেখে থমকে গেল ও, বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ।

লিভিংরুমের দূর প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে দলটা। হাসছে, কথা বলছে। কেউ কেউ মদ খাচ্ছে। বরফের টুংটাং শব্দ ভেসে আসছে।

ঘরের পুব দিকে, বড় জানালাটার পাশে, কালো একটা দোলনা। দোলনার মাথার ওপরে রেশমি কাপড়ের ঝালর দেয়া হুড। এটার রঙও মিশমিশে কালো।

বাচ্চাটা কি মারা গেছে? না, দোলনাটা সামান্য দুলে উঠল, হুডের সাথে বাঁধা ছোট্ট একটা ঘন্টা মিষ্টি শব্দে বেজে উঠল সেই

সাথে।

বেঁচে আছে আদিত্য। শুয়ে আছে প্রেত সাধকদের বিকট, কালো রঙের দোলনায়।

বাচ্চাটা অসহায় এবং তাকে শয়তানের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হবে মনে পড়তেই অশ্রুসজল হয়ে উঠল রোজীর চোখ, বুকের ভেতর ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল ছুটে গিয়ে আদরের ধনটাকে কোলে টেনে নিতে। মন চাইল ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। বিনিময়ে ওর সন্তানকে ফিরিয়ে দিক ওরা। বুক ফেটে কান্না এল। একই সাথে অন্তরের অন্তস্তল থেকে বিশাল ঢেউয়ের মত উগরে এল ঘৃণা, প্রতিটি রোমকূপে ছড়িয়ে পড়ল অনুভূতিটা। প্রচণ্ড ঘৃণা করল রোজী রবার্ট, মিনি, সীমান্ত, ডা. মোস্তাফিজুর রহমানসহ ওদের সবাইকে যারা আদিত্যকে কেড়ে নিয়েছে ওর বুক খালি করে নিজেদের ঘৃণ্য স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। ম্যাক্সিতে ঘামে ভেজা হাত মুছল ও, অন্য হাতে শক্ত করে ধরল ছুরির বাঁট, তারপর ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। এমন জায়গায় দাঁড়াল যেখান থেকে সবাই ওকে দেখতে পায়।

সাথে সাথে অবশ্য কেউ রোজীকে খেয়াল করল না। ওরা কথা বলছে, হাসছে, পানীয়র গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। কেউ ওর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। যেন সে একটা অশরীরী, দেখতে পাচ্ছে না কেউ তাকে।

ওরা সবাই, মি. এবং মিসেস ডি সুজা, সীমান্ত, (ও তো বাসা থেকে বেরিয়েছিল নতুন ছবির চুক্তিপত্রে সাইন করার কথা বলে!) স্টিফেন গনজালেস, ডা. মোস্তাফিজুর রহমান, রানু অধিকারী, ফ্লোরেন্সরা দুই বোন সহ এক পাঞ্জাবী শিখ বসে আছে ক্লেমেন্ট গোমেজের একটা ম্যান্টেল পোর্ট্রেটের সামনে। শুধু ক্লেমেন্ট গোমেজই যেন রোজীকে দেখছে। ছবিতে দাঁড়িয়ে আছে পিশাচ-সাধক, স্থির, শক্তিশালী; আসলে শক্তিহীন একটা পেইন্টিং।

হঠাৎ রবার্ট ডি সুজার চোখ পড়ল রোজীর দিকে; গ্লাসটা নামিয়ে রেখে স্ত্রীর হাত ধরে আকর্ষণ করলেন তিনি। অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এল ঘরে, রোজীর দিকে যারা পেছন ফিরে বসেছিল, তার প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে ঘাড় ঘোরাতে শুরু করল। ছুরি হাতে রণরঙ্গিণী মূর্তিকে দেখে জমে গেল সবাই। সীমান্ত উঠে দাঁড়াচ্ছিল, আবার বসে পড়ল ধপ করে। ফ্লোরেন্স মুখে হাত চাপা দিলেন, রীতিমত গোঙাতে শুরু করলেন। রানু অধিকারী গলায় কর্তৃত্ব ফোটাতে চাইলেন, 'এখানে কি করছ, রোজমেরী? যাও, বিছানায় যাও। এখানে তোমার থাকার কোন প্রয়োজন নেই।'

'এই ভদ্রমহিলাই মা নাকি?' হিন্দিতে প্রশ্ন করল পাগড়ি পরা শিখ। রবার্ট মাথা ঝাঁকালে 'চুক চুক' শব্দ করল সে জিভ দিয়ে, আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকল রোজীর দিকে।

'ও রিয়াকে খুন করেছে,' লাফ মেরে উঠে দাঁড়ালেন স্টিফেন গনজালেস। 'ও আমার মেয়েকে খুন করেছে!' তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন তিনি।

রোজী স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে, তার চোখের মণি নড়ে উঠল, মুখ ঘোরাল। চোখে চোখ পড়তেই ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠল সীমান্তর, মাথা নিচু করে ফেলল সে।

আরও শক্ত করে চেপে ধরল রোজী ছুরির বাঁট।

'হ্যাঁ,' কর্কশ শোনাল তার কণ্ঠ। 'আমি রিয়াকে হত্যা করেছি। কুপিয়ে কুপিয়ে মেরেছি। তারপর ধুয়ে ফেলেছি রক্ত। আমার সামনে যে আসবে তাকেই খুন করে ফেলব। কাজেই সাবধান!'

কেউ কথা বলছে না। স্টিফেন গনজালেসের লাফ-ঝাঁপ থেমে গেছে। তিনি বুকে হাত দিয়ে বসে পড়লেন। ফ্লোরেন্সের গলা দিয়ে কুঁই কুঁই আওয়াজও ম্লান হয়ে এল। তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী কালো বেড়ালটাকে আজ দেখা যাচ্ছে না।

রোজী এবার তাকাল ঘরের কোণে রাখা কালো দোলনার

দিকে।

'রোজমেরী,' ডাকলেন রবার্ট ডি সুজা।

'চুপ!' ধমকে উঠল রোজী।

'একটা কথা শোনো—'

'চুপ করুন।' বলল ও। 'আপনার তো এখন আগ্রায় থাকার কথা। আপনার কোন কথা আমি শুনব না।'

'থাক্, চুপ করো,' বললেন মিসেস ডি সুজা।

ওদের দিকে কড়া নজর রেখে দোলনার কাছে চলে এল রোজী। দোলনার মাথার দিকটা ওদের দিকে ঘোরানো। সে খালি হাতটা দিয়ে দোলনাটা ঘুরিয়ে দিল নিজের দিকে। টিং টিং শব্দে বেজে উঠল ঘন্টা।

শুয়ে আছে ও। গোলাপী রঙের ভারি মিষ্টি এবং ছোট্ট একখানা মুখ। আদিত্যকে কালো একটা কাঁথা দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা হয়েছে, কব্জিতে কালো ফিতে জড়ানো দস্তানা সহ। মাথার চুলগুলো ঘন, কোঁকড়ানো, রেশম ঝলমলে। আদিত্য, ওহ্, আদিত্য! হাত বাড়াল রোজী, ঠিক তখন নড়ে উঠল টুকটুকে লাল ঠোঁট জোড়া, চোখ মেলে চাইল সে, সারাসরি তাকাল ওর দিকে। প্রচণ্ড ধাক্কা খেল রোজী। বাচ্চাটার চোখের রঙ সোনালী-হলুদ, সাদার লেশ মাত্র নেই, পুরোটাই সোনালী-হলুদ রঙের, চোখের পাপড়িগুলো কালো, বাঁকা হয়ে উঠে গেছে ওপরের দিকে।

বাচ্চাটা তাকিয়েই থাকল রোজীর দিকে। স্থির, অপলক চাউনি।

ঘুরে দাঁড়াল রোজী। সবাই ওকে লক্ষ করছিল। ছুরিটা উঁচিয়ে ধরল সে ওদের দিকে। চিৎকার করতে গিয়ে ভেঙে গেল গলা, 'তোমরা ওর চোখের একি দশা করেছ?' ভয়ে সিঁটিয়ে গেল অন্যান্যরা, জবাবের আশায় যেন তাকাল রবার্ট ডি সুজার দিকে।

'সে তার বাবার মত চোখ পেয়েছে,' বললেন রবার্ট ডি সুজা।

রোজী রবার্টের দিকে তাকাল, তারপর দৃষ্টি ঘুরে গেল সীমান্তর দিকে—হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছে সে—আবার রবার্টের চোখে চোখ রাখল রোজী।

'মিথ্যা কথা বলবেন না,' গর্জে উঠল ও। 'সীমান্তর চোখ কালো এবং স্বাভাবিক। তোমরা আমার বাচ্চার এমন দশা কেন করলে?' দোলনার পাশ থেকে সরে এল রোজী, হত্যার জন্য প্রস্তুত।

'শয়তান ওর বাবা, সীমান্ত নয়,' বললেন রবার্ট। 'শয়তান ওর পিতা যিনি নরক থেকে নেমে এসে পৃথিবীর নারীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছেন। তিনি সেই মহান শয়তান যিনি পৃথিবী থেকে ঈশ্বরের পূজারীদের দূর করে তাঁর ভক্ত-অনুসারীদের রাজত্ব কায়েম করবেন।'

'শয়তানের জয় হোক,' বললেন রানু অধিকারী।

'শয়তান তার পিতা। তার নাম ক্লেমেন্ট!' চেঁচিয়ে উঠলেন রবার্ট, তার গলা ক্রমশ চওড়া এবং জোরাল হয়ে উঠল। 'সর্বশক্তিমানকে বিতাড়িত করে তিনি সমস্ত ধর্ম উপাসনালয়-গুলোকে ধ্বংস করে ফেলবেন। তাঁর অনুসারীদের ওপর এতকাল যে অন্যায়-অত্যাচার এবং অবিচার চলেছে তার প্রতিশোধ তিনি নেবেন। তাঁরই প্রতিভূ হিসেবে তোমার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন মহান প্রেতসাধক ক্লেমেন্ট গোমেজ।'

'ক্লেমেন্টের জয় হোক,' সমস্বরে বলে উঠল সবাই।

'জয়তু ক্লেমেন্ট।' 'জয়তু ক্লেমেন্ট।' 'জয়তু শয়তান।' একভাবে চেঁচাতেই লাগল ওরা।

'না!' কানে হাত চাপা দিয়ে চিৎকার করে উঠল রোজী।

মিসেস ডি সুজা বললেন, 'তিনি তোমাকে সবার মধ্য থেকে নির্বাচন করেছেন, রোজী। পৃথিবীর সমস্ত নারীদের মাঝ থেকে। তিনিই তোমাকে এবং সীমান্তকে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। এটাই ছিল তোমাদের নিয়তি। শীলা নামের মেয়েটাকে দিয়ে

আমরা কাজ চালাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে এত বোকা এবং ভীতু ছিল যে শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে পরিকল্পনা বদলাতে হয়। তারপর তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেন। তাঁর নির্দেশে আগে ভাগেই সব ব্যবস্থা হয়ে যায়। তিনি ষড়যন্ত্রকারী এবং তাঁর প্রতি অবিশ্বাসীদের পছন্দ করেন না। তাদেরকে তিনি ধ্বংস করেন। যেমন ধ্বংস হয়েছেন আভা পলগুডা, অ্যালবার্ট ডেভিডসহ আরও অনেকে। তিনি পছন্দ করেছেন তোমাকে। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর উত্তরাধিকারী এবং একমাত্র জীবিত পুত্রের মা হবে তুমি।'

'তাঁর শক্তি সর্বাধিক শক্তিধরের চেয়েও বেশি,' বললেন রবার্ট।

'শয়তানের জয় হোক,' আবার চেঁচালেন রানু অধিকারী।

'তাঁর শক্তির কোন ক্ষয় নেই।'

'হেইল শয়তান,' বলল পাঞ্জাবী শিখ।

মুখের ওপর থেকে এতক্ষণে হাত নামালেন ফ্লোরেন্স। সীমান্ত আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকল স্ত্রীর দিকে।

'না,' এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল রোজী, হাতে ধরা ছুরিটা কাঁপছে। 'এ কিছুতেই হতে পারে না।'

'যাও, তার হাত দেখো গিয়ে,' বললেন মিসেস ডি সুজা। 'পা দুটোও দেখো।'

'সেই সাথে ওর লেজ,' যোগ করলেন মিসেস রানু। 'আর ওর মাথার কচি শিং দুটো।'

'হে, ঈশ্বর!' বলল রোজী।

'ঈশ্বর মারা গেছেন,' বললেন রবার্ট।

দলটার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল রোজী, মুঠো থেকে ছুরিটা খসে পড়তে দিল, মুখ তুলে চাইল ছাদের দিকে, হাত দুটো মাথার ওপরে তুলে চিৎকার শুরু করে দিল, 'হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর!'

'ঈশ্বর মৃত।' বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করলেন রবার্ট। 'ঈশ্বর মারা

গেছে। বেঁচে আছেন শয়তান। আবার তিনি ফিরে এসেছেন আমাদের মাঝে মহান প্রেত সাধক ক্লেমেন্ট গোমেজের রূপ ধরে!'

'শয়তানের জয় হোক!' কোরাস গাইতে শুরু করল ওরা। 'শয়তানের জয় হোক!' 'ক্লেমেন্ট গোমেজের জয় হোক!' 'শয়তানের জয় হোক!'

'না, না!' চিৎকার করেই যেতে লাগল রোজী। চিৎকার করতে করতে পিছু হঠতে লাগল ও, শেষে দুটো ব্রিজ টেবিলের মাঝখানে বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পেছনে একটা চেয়ার ছিল; ওটাতে বসে পড়ল রোজী, বিস্ফারিত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে শব্দটা আবার উচ্চারণ করল, 'না।'

রোজীর উদ্‌ভ্রান্ত, ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে প্রথমে আত্মা উড়ে গিয়েছিল মি. স্টিফেন গনজ্বালেসের। তারপর মেয়ে রিয়ার কথা শুনে তিনি হার্টফেল করতে বাকি রেখেছিলেন। রোজীকে চেয়ারে বসে পড়তে দেখে তাড়াতাড়ি ছুটলেন তিনি মেয়ের খোঁজ নিতে। আর স্ত্রীর অসহায় দৃষ্টির সামনে নিজেকে বিব্রত এবং অপরাধী মনে হচ্ছিল সীমান্তর। সে-ও রিয়ার খোঁজ নেয়ার ছুতোয় যেন পালিয়ে বাঁচল।

মিসেস ডি সুজা মেঝে থেকে রোজীর ছুরিটা তুলে নিলেন, রেখে এলেন রান্নাঘরে।

রানু অধিকারী দোল দিতে শুরু করলেন দোলনায়। ঘণ্টাটা আবার টুংটাং শব্দে বাজতে লাগল।

রোজী চেয়ারে বসে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়েই আছে। 'না,' অবসন্নভাবে মাথা নাড়ল ও। গোটা ব্যাপারটাকে এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

রবার্ট ওর পাশে এসে বসলেন। নরম গলায় বললেন, 'তুমি আমাদের দলে যোগ দাও, রোজী। ক্লেমেন্টের মায়ের ভূমিকা পালন

করো। শয়তান তোমাকে সব কিছু দেবেন, রোজী। যা চাইবে সব। তোমার স্বামী আমাদের কোভেনে যোগ দেয়ার পরে তার ক্যারিয়ারের সমৃদ্ধি ঘটতে শুরু করেছে। আমাদের কোভেনে শুধু খ্রিস্টান নয়, সবাই আছে। শয়তান কোন ভেদাভেদ মানেন না। যে কোন ধর্মের মানুষ তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেই তিনি খুশি। বিনিময়ে তিনি তাঁর ভক্ত অনুসারীকে দেন ধন-দৌলত-নাম-যশ সব কিছু। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে তুমি চাইলেই এসব পাবে না। আমাদের দলে যারা আছে তোমার ঈশ্বর তাদেরকে কিছুই দিতে পারেনি। কিন্তু শয়তান পেরেছেন। তিনি শক্তিতে, বুদ্ধিতে, ক্ষমতায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সেরা।'

এ পর্যন্ত বলে রবার্ট একটু বিরতি দিলেন। তাঁর চোখ দুটো অসম্ভব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। মেঘ-মন্দ্র স্বরে তিনি আবার শুরু করলেন, 'রোজী, আবার তিনি ফিরে এসেছেন আমাদের মাঝে। তিনশো বছর আগে একবার তিনি এসেছিলেন পৃথিবীতে। কিন্তু সেবার তাঁকে ইংল্যান্ডে পুড়িয়ে মারা হয় ডাইনী সন্দেহে। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর অনুসারীদের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন, ঠিক তিনশো বছর পরে, প্রথম একত্রিশে অক্টোবরের রাতে, আবার আবির্ভাব ঘটবে তাঁর। আর এ বছরটাই সেই বিশেষ বছর। এ বছরের একত্রিশে অক্টোবরই সেই প্রথম একত্রিশে অক্টোবরের রাত হতে যাচ্ছে। আগামী একত্রিশে অক্টোবর রাতে আবার আবির্ভূত হবেন তিনি।

'রোজী, এখন আর তোমার কাছে গোপন করার কিছু নেই। আমার পিতা যখন শয়তানের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পথে, এই সময় মিথ্যা রাজাকারীর অভিযোগ এনে তাঁকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। আমার ওপরেও আক্রমণ হতে পারে এই ভয়ে আমি পালিয়ে যাই ইউরোপে। তারপর সুযোগ বুঝে চলে আসি বাংলাদেশে। এখনও দু'একজন ছাড়া কেউ জানে না আমার আসল

পরিচয়। আমি গত সাতাশ বছর ধরে প্রতিশোধের আগুন বুকে চেপে রেখেছি, রোজী। পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন সফল করতে অনেক আগে থেকেই প্রেত সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছি। একান্ত সঙ্গিনী হিসেবে পেয়েছি মিনিকে। অবশেষে আমার স্বপ্ন সফল হতে শুরু করেছে। এ বাড়ির সমস্ত মানুষ আমার একান্ত অনুগত। ওদেরকে আমি সব কিছু পাইয়ে দেয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছি। আমাদের গোপন দলের সদস্য সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে। সমাজের অনেক বড় মাপের মানুষও আছেন আমাদের দলে। তবে সবার পরিচয় দলের সাধারণ সদস্যরা জানে না। আমাদের সবার স্বপ্ন— নিজেদের ইচ্ছেমত একটি রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করব। আর তার জন্য চাই অলৌকিক ক্ষমতা। আর আমরা বিশ্বাস করি, এই ক্ষমতা দেয়ার উদারতা দেখাতে পারেন একমাত্র শয়তান। আমরা বিশ্বাস করি, তোমার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন শয়তান-পুত্র। বিশ্বাস করি, তিনি আমাদের মহান পিতা ক্লেমেন্ট গোমেজ। তিনিই আমাদের প্রভু। এই প্রভুর মা তুমি। আগামী একত্রিশে অক্টোবর স্বয়ং শয়তান আবির্ভূত হবেন আমাদের সামনে। তাঁর সন্তানকে আশীর্বাদ করে যাবেন। আর আমাদেরকে দিয়ে যাবেন প্রভূত ক্ষমতা। সেই ক্ষমতার অংশীদার তুমিও হবে, রোজী। সব কিছু তুমি পাবে। শুধু আমাদের দলে যোগ দাও। আর তাঁর সন্তান, মানে তোমার সন্তানের প্রতি মায়ের দায়িত্ব পালন কোরো।'

ম্যানিয়াকটার দীর্ঘ বক্তৃতা ভাবলেশহীন মুখে শুনে গেল রোজী। কোন মন্তব্য করল না। একসাথে এতগুলো কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন রবার্ট। হঠাৎ ডোরবেল বেজে উঠল।

'এক মিনিট,' বললেন তিনি। 'আসছি এক্ষুণি। তবে আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখো,' তিনি দরজা খুলতে চলে গেলেন।

'হে ঈশ্বর!' গুঙিয়ে উঠল রোজী।

'তোমার হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর! বন্ধ করো তো!' খেঁকিয়ে

উঠলেন রানু। 'বাচ্চার খিদে পেয়েছে। ওকে দুধ দিলে দাও। না হলে খুন করব তোমাকে।'

'আহ্, চুপ করো, রানু!' ধমক দিলেন মিসেস ডি সুজা। 'রোজীর সাথে খারাপ ব্যবহার করা চলবে না। রোজী মহান শয়তানের মা। কথাটা ঘিলুর মধ্যে আটকে রেখে ওকে একটু সম্মান দেখাতে চেষ্টা কোরো।'

রানু অধিকারী বিড় বিড় করে কি বললেন বোঝা গেল না।

রোজী হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। শিখ লোকটা ঘরের এক কোণে বসে ক্যামেরায় ফিল্ম ভরছিল, মুখ তুলে চাইল। রোজীর সাথে চোখাচোখি হতে সবজান্তার ভঙ্গিতে হাসল। চোখ ফিরিয়ে নিল রোজী। কাঁদতে শুরু করল।

কোট-প্যান্ট পরা, অত্যন্ত সুদর্শন, এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোককে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন রবার্ট ডি সুজা। সবাই তাঁকে দেখে অভিবাদন জানাল। ভদ্রলোকের হাতে একটা প্যাকেট। প্যাকেটের ভেতর বন্দী হয়ে আছে নাদুসনুদুস একটা টেডি বিয়ার। প্যাকেটটা জানালার পাশে, র‍্যাপার মোড়ানো আরও কয়েকটি প্যাকেটের সাথে রেখে দিলেন তিনি। সবগুলো প্যাকেটই কালো কাগজে মোড়া।

'অভিনন্দন, মি. রবার্ট,' ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'অবশেষে আপনার এবং আমাদের সকলের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে।'

'জ্বী, মি. দত্ত,' বললেন রবার্ট। 'আগামী একত্রিশে অক্টোবর রাত ঠিক বারোটায় স্বয়ং শয়তানের আগমন ঘটবে আমাদের কোভেনে।'

'তিনশো বছর আগে প্রখ্যাত প্রেত সাধক এডমন্ড লট্রেমন্ট ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন না ঠিক এই দিনে আবার শয়তানের আবির্ভাব ঘটবে?'

'হ্যাঁ। এই দিনটির জন্য আমরা অপেক্ষায় ছিলাম, মি. দত্ত,' বললেন রবার্ট। 'আসুন, বন্ধু। তাঁকে দেখে যান।'

রবার্ট মি. দত্তকে নিয়ে দোলনার দিকে এগিয়ে গেলেন। ভদ্রলোককে দেখে গদগদ একটা ভাব ফুটে উঠল রানু অধিকারীর চেহারায়। তিনি সসম্মানে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন। দত্ত বাবু দোলনায় শোয়া শিশুটিকে দেখলেন শ্রদ্ধা মাখানো দৃষ্টি নিয়ে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে সম্মান দেখালেন।

ইতিমধ্যে সীমান্ত আবার ফিরে এসেছে। আগন্তুককে দেখে সাগ্রহে হাত মেলাল। বলল, 'কেমন আছেন, স্যার?'

'ভাল,' মৃদু হাসলেন দত্ত বাবু। 'আমাদেরকে এখন জোরেসোরে কাজে নামতে হবে, তাই না?'

'জ্বী, স্যার। তবে শুরুতেই বেশি হৈচৈ করা যাবে না। গোপনে কাজ চালাতে হবে।'

'তা তো অবশ্যই।' বললেন ভদ্রলোক।

'স্যার, আমার স্ত্রীর সাথে কি আপনার পরিচয় হয়েছে?' ব্যস্ত সুরে বলল সীমান্ত। রোজীর দিকে ঘুরে বলল, 'রোজ, ইনি জেনারেল রমেশ দত্ত। বিরোধী দলের নেতা। দত্ত বাবুও আমাদের সাথে আছেন, বুঝতেই পারছ।'

রোজী কিছু বলল না। চুপ করে রইল। এমন সম্মানীয় একজন মানুষকে একটা সালাম পর্যন্ত দিল না দেখে স্ত্রীর ওপর রাগ হলো সীমান্তর। কিন্তু এখন রাগ দেখানোর সময় নয়। সে গলার স্বরটাকে মোলায়েম করে বলতে লাগল, 'তোমার মন খারাপের কিছু নেই, রোজমেরী। ধরে নাও আমাদের একটা সন্তান হয়েছিল সে মারা গেছে। তা হলে তো ব্যাপারটা একই হলো, তাই না? বিনিময়ে আমরা কত কিছু পেতে চলেছি তা একবার ভাব, রোজ।'

সর্বশক্তি দিয়ে থুথু ছুঁড়ল রোজী। সীমান্তর সারা মুখ ভরে গেল

সাদা ফেনায়।

লজ্জা আর অপমানে ফর্সা মুখ রাঙা হয়ে উঠল, জামার হাতায় মুখটা মুছতে মুছতে দত্ত বাবুর দিকে তাকিয়ে, 'আসছি, স্যার' বলে কোনমতে কেটে পড়ল। জেনারেল দত্ত হাসলেন শুধু।

ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ নিয়ে এগিয়ে এলেন মিসেস ডি সুজা। বললেন, 'মাফ করবেন, দত্ত বাবু। আমাদের রোজমেরীর শরীরটা তেমন ভাল নেই।' তিনি রোজীর দিকে ঘুরলেন। 'খাও মা। এটা খেয়ে নাও। ভাল লাগবে?'

রোজী ধূমায়িত কাপের দিকে একবার তাকাল, তারপর চোখ তুলে চাইল মিসেস ডি সুজার দিকে, 'এর মধ্যে কি দিয়েছেন? ট্যানিস রুট?'

'এটার মধ্যে কিছু নেই,' বললেন ডি সুজা। 'শুধু চিনি আর লেবু ছাড়া। নাও। লেবু চা-টা খেয়ে ফেলো। চাঙা লাগবে শরীর।'

কাজ একটাই—খুন করতে হবে ওটাকে। ওরা সবাই যখন একত্র হয়ে ঘরের কোণে বসবে, তখন দৌড় দিয়ে দোলনার কাছে গিয়ে রানু অধিকারীকে ধাক্কা মেরে একটানে ওটাকে তুলে নিতে হবে, তারপর ফেলে দিতে হবে জানালা দিয়ে এবং নিজেও লাফিয়ে পড়তে হবে। পরদিন খরের কাগজে ছাপা হবে: ড্রিম হাউজে আবার আত্মহত্যার ঘটনা। সন্তানকে হত্যা করে, মায়ের আত্মহত্যা।

ব্যস, তাহলেই সমস্ত যন্ত্রণা জুড়োবে। পৃথিবী রক্ষা পাবে শয়তানের হাত থেকে।

ওটার লেজ আছে! মাথায় শিং আছে! কথাটা মনে পড়তে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল রোজীর, মরে যেতে ইচ্ছে করল। নাহ্, ওকে কোনভাবেই বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। ওকে জানালা দিয়ে ফেলে দিয়ে রোজীকেও লাফিয়ে পড়তে হবে।

প্রেতপূজারীর দলের সবাই একত্র হতে শুরু করেছে। বেশ

একটা ককটেল পার্টির ভাব। শিখটা সবার ছবি তুলছে; সীমান্ত, জেনারেল দত্ত, বাচ্চা কোলে রানু অধিকারী।

মুখ ঘোরাল রোজী, দেখতে চায় না ওসব। ওই চোখ জোড়া! মাগো, কি ভয়ঙ্কর চোখ, মানুষের অমন চোখ থাকে না। থাকে বাঘ বা সিংহের।

অবশ্য ওটা তো মানুষ নয়। ওটাকে কি বলা যায়— এক ধরনের হাফ-ব্রীড।

অথচ ওটা যখন চোখ বন্ধ করে ছিল কি সুন্দর লাগছিল দেখতে। ছোট্ট, খাঁজকাটা চিবুক, এক মাথা রেশম কোমল চুল, ভারি মিষ্টি একখানা মুখ…ওর দিকে আবারও ফিরে তাকানো যায়, যদি চোখ বন্ধ থাকে।

কাপে চুমুক দিল রোজী। সত্যি চা। না, পারবে না রোজী ওকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে। ও তার সন্তান। বাপ যে-ই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। ওকে নিয়ে পালিয়ে যাবে সে। যেতে হবে এমন কারও কাছে যে তার সমস্ত কথা বিশ্বাস করবে। আবার চার্চের কথা মনে পড়ল রোজীর। হ্যাঁ, বাচ্চাটাকে নিয়ে সে চার্চের কাছেই যাবে। চার্চ তারপর যা খুশি সিদ্ধান্ত নিক। ওকে হত্যা করা ভুল হবে রোজীর।

চায়ের কাপে ঘন ঘন চুমুক দিতে লাগল সে।

বাচ্চাটা আবার কান্না জুড়ে দিয়েছে। দেবেই তো, রানু অধিকারী এত দ্রুত দোলনাটা দোলাচ্ছেন, বাচ্চা হয়তো ভয়েই কাঁদছে।

উঠে দাঁড়াল রোজমেরী হাসান। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর দোলনার দিকে পা বাড়াল।

'ভাগো এখান থেকে,' ওকে দেখে খ্যাক খ্যাক করে উঠলেন মিসেস রানু। 'ওর কাছেও এসো না, খবরদার!'

'আপনি ওকে ব্যথা দিচ্ছেন,' অভিযোগের সুরে বলল রোজী।

'এত জোরে দোলাবেন না। ভয় পাচ্ছে ও।'

'রবার্ট,' বললেন রানু। 'ওকে এখান থেকে যেতে বলো তো!'

রোজী বলল, 'উনি বেশি জোরে দোলনা দোলাচ্ছেন। বাচ্চা তাই কাঁদছে।'

'যাও। যাও। নিজের কাজে যাও।' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলেন রানু।

'রোজমেরীকে দোলাতে দাও,' আদেশ করলেন রবার্ট।

রানু অধিকারী ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন তাঁর দিকে।

'তুমি এখন যেতে পারো,' আবার বললেন রবার্ট। 'দলের লোকজনের সাথে গিয়ে বসো এবার। রোজমেরী ওকে দোলাক।'

'কিন্তু ও—'

'যা বলছি করো, রানু।' গা হিম করা গলায় বললেন রবার্ট।

মুখ কালো করে চলে গেলেন রানু।

'যাও, ওকে দোলাও গিয়ে,' রোজীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন রবার্ট।

রোজী তার জায়গায় অনড় দাঁড়িয়ে থাকল।

'আপনি আমাকে ওর মা'র দায়িত্ব পালন করানোর চেষ্টা করছেন!'

'তুমি কি ওর মা নও?' বললেন রবার্ট। 'যাও, কাজ শুরু করে দাও। দেখছ না কান্না থামছে না।'

আর কথা না বলে দোলনার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রোজী, মৃদু, হালকা ভাবে দোল দিতে শুরু করল। বাচ্চাটার দিকে তাকাল সে একবার, চেয়ে আছে ওর দিকে হলুদ চোখ মেলে। রোজী দ্রুত একবার খোলা জানালার দিকে নজর বোলাল।

'দেখলে,' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন রবার্ট, 'আসল মানুষের সান্নিধ্য টের পেয়ে কান্না কেমন থেমে গেছে।'

কোন কথা বলল না রোজী। আগের মত দোল দিতে লাগল। বাচ্চাটা এক দৃষ্টিতে ওকে দেখছে। এখন আর ওকে আগের মত

ভয়ঙ্কর লাগছে না দেখতে। 'ওর হাত দুটো দেখতে কেমন হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রোজী।

'খুব সুন্দর,' বললেন রবার্ট। 'হাত তো নয়, আসলে থাবা বলাই ভাল। খুব ছোট ছোট নখ আছে থাবা জোড়ায়। তবে ভোঁতা নখ। খামচি খাওয়ার ভয় নেই।'

'ওকে দেখে মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছে,' বলল রোজী।

ডা. মোস্তাফিজুর রহমান এতক্ষণে এসে ওর পাশে দাঁড়ালেন। 'এত লোক কখনও একসঙ্গে দেখেনি তো তাই।'

'আপনার কাছে কে জানতে চেয়েছে?' গরগর করে উঠল রোজী। 'যান এখান থেকে। নইলে থুথু মারব কিন্তু।'

'যান, মোস্তাফিজ সাহেব,' বললেন রবার্ট।

মাথা দুলিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার।

'তুমি নও,' বাচ্চাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল রোজী, 'তোমার কোন দোষ নেই। আমি ওদের ওপর খুব রেগে আছি। কারণ ওরা আমার সাথে প্রতারণা করেছে, আমাকে মিথ্যা কথা বলেছে। অমন ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে তাকাতে হবে না। আমি তোমাকে মারব না।'

'জানে ও সে কথা,' বললেন রবার্ট ডি সুজা।

'তাহলে ওর চেহারা এমন মলিন দেখাচ্ছে কেন?' জিজ্ঞেস করল রোজী। 'আহা, বেচারা!'

'আমি মেহমানদের সাথে একটু কথা বলে আসি, রোজী,' বলে রোজীকে একা রেখে চলে গেলেন তিনি।

'সত্যি বলছি, তোমায় আমি মারব না,' ঝুঁকল সে, বাচ্চার গাউনের ফিতে আলগা করে দিল গলার ওপর থেকে। 'রানু গাউনটা খুব শক্ত করে বেঁধে দিয়েছিল, না? আমি এই ফিতে খুলে দিলাম। এখন একটু আরাম পাবে। আচ্ছা, তুমি কি জানো, তোমার চিবুকটা ভারি সুন্দর? তোমার হলুদ চোখ দুটো অদ্ভুত কিন্তু চিবুকটা বড্ড

সুন্দর।'

বাচ্চাটার নরম চুলে হাত বোলাল রোজী। এবং চমকে উঠল। শক্ত শক্ত কি যেন ঠেকল হাতে। সত্যি যেন দুটো ছোট্ট শিং-এর আভাস পাচ্ছে সে মাথার পেছন দিকে। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছে করল না। আহা, বেচারা! দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে একটা। ও যদি অর্ধেক শয়তান হয়েও থাকে তাহলে বাকি অর্ধেকটা তো তারই অংশ। বাকি অর্ধেক সুন্দর, স্বাভাবিক, সংবেদনশীল, মানুষের মত?

'তোমার জন্য আলাদা একটা ঘর সাজিয়েছি আমি, জানো?' আবার কথা বলতে শুরু করল রোজী। গায়ের নকশী কাঁথাটাও শক্ত করে পেঁচানো, বাঁধন আলগা করে দিল সে। 'তোমার ঘরের দেয়ালে সাদা আর হলুদ রঙের ওয়াল-পেপার আছে, আছে ধবধবে সাদা রঙের দোলনা। সারা ঘরের কোথাও এই বিশ্রী কালো রঙের ছোঁয়া মাত্র নেই। তুমি যখন আবার দুধ খেতে চাইবে তখন তোমাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাব, কেমন? তুমি কি জানো, জন্মের পর থেকে যার দুধ খাচ্ছ সে এই আমি? তুমি বোধহয় ভেবেছিলে বোতল থেকে দুধ আসে, নাকি? আরে না, বোকা। দুধ আসে মায়েদের বুক থেকে। যেমন আমি তোমার মা। হ্যাঁ, মি. ভীতু মুখ, সেটাই ঠিক।'

হঠাৎ সব এমন নীরব হয়ে গেল কেন বুঝতে না পেরে মুখ তুলে চাইল রোজী। দেখল সবাই ওকে দেখছে, সম্মানজনক দূরত্ব রেখে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

লালচে ছোপ ধরল রোজীর গালে, দ্রুত হাতে বাচ্চার গায়ে কাঁথা টেনে দিল। 'ওরা দেখছে, দেখুক।' বলল সে। 'আমরা গ্রাহ্য করি না। আমরা শুধু জানি এই পৃথিবীতে তুমি আর আমি শুধু আছি।'

'রোজমেরীর জয় হোক,' বললেন ফ্লোরেন্স। বাকিরা কোরাস

শুরু করে দিল। 'রোজমেরীর জয় হোক।'

'রোজমেরীর জয় হোক।' এমনকি জেনারেল দত্ত এবং সীমান্তও ওদের সাথে গলা মেলালেন। রানু অধিকারীও বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগলেন, গলা থেকে অবশ্য স্বর বেরুল না তাঁর।

'জয়তু রোজমেরী, মহান ক্লেমেন্টের মা,' বললেন রবার্ট।

তার দিকে ঠাণ্ডা চোখে চাইল রোজী। 'ওর নাম আদিত্য।'

'না, ক্লেমেন্ট গোমেজ।' বললেন রবার্ট।

সীমান্ত বলল, 'আঙ্কেল, থাক না। নামে কি আসে যায়?'

'অনেক কিছুই আসে যায়,' গোঁয়ার-গোবিন্দের মত বললেন রবার্ট। 'ওর নাম ক্লেমেন্ট গোমেজ।'

রোজী বলল, 'আমি বুঝতে পারছি আপনি কেন ওকে ওই নামে ডাকতে চাইছেন। কিন্তু আমি দুঃখিত। আমার পক্ষে এই নামে ডাকা সম্ভব নয়। আমি ওর নাম রেখেছি আদিত্য। ও আমার সন্তান, আপনার নয়। আর অন্তত এই একটি ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে কোন তর্কে যেতে চাই না। আর শুনুন, ওকে সব সময় কালো কাপড় পরিয়ে রাখবেন না তো। কালো কাপড়ে আমার সুন্দর আদিত্যকে মানায় না।'

রবার্ট কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মিসেস ডি সুজা বলে উঠলেন, 'জয়তু আদিত্য।'

এবার প্রত্যেকে গলা ফাটাল, 'জয়তু আদিত্য। আদিত্যের জয় হোক।'

'জয়তু রোজমেরী।'

রোজী বাচ্চার পেটে সুড়সুড়ি দিয়ে বলল, ' "ক্লেমেন্ট" নামটা খুব পচা, তাই না সোনা? তোমার নিশ্চয়ই নামটা পছন্দ হয়নি? তুমি আমার আদিত্য। আচ্ছা, আদিত্য, তুমি তখন থেকে অমন ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছ কেন?' সে নাকের ডগা নেড়ে দিল আদর করে। 'কিভাবে হাসতে হয় জানো? মাকে একটু হাসিমুখ দেখাও না।

একটু হাসো না! এই আদিত্য, একটু হাসো, বাবা!' বলতে বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল রোজী।

লাফ মেরে ক্যামেরা নিয়ে এগিয়ে এল শিখ। সোনালী-হলুদ চোখ মেলে অপলক তাকিয়ে আছে বাচ্চা, দোলনায় হেলান দিয়ে মা কাঁদছে,—দৃশ্যটি অপূর্ব মনে হলো তার কাছে। সে দ্রুত কয়েকটা স্ন্যাপ নিয়ে নিল সময় নষ্ট না করে।

***

হরর থ্রিলার

প্রেতপুরী

শ্বাসরুদ্ধকর ভয়ের উপন্যাস

অনীশ দাস অপু

ঢাকার মণিপুরী পাড়ার 'ড্রিম হাউজ'টা চেনেন?
ওই যে ভিক্টোরিয়ান স্টাইলে তৈরি ৮/১০ নম্বর বাড়িটি,
যার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল রোজমেরী হাসান।
তবে সাবধান, ড্রিম হাউজ-এর ফ্ল্যাট কম
ভাড়ায় পাওয়া যাবে শুনলে ভুলেও
ওদিকে পা বাড়াবেন না। তা হলে,
আপনার দশা হতে পারে রোজমেরীর মতই।
আপনার জীবনেও ঘটতে পারে দুঃস্বপ্নকে
হার মানানো রোমহর্ষক সব ঘটনা।
আপনিও হতে পারেন প্রতিবেশীর
ছদ্মবেশধারী একদল ভয়ঙ্কর পিশাচের গা
হিম করা চক্রান্তের শিকার!



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

